কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

(অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা সহ)

ক্ষেত্র গুপ্ত

অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা

গ্র ন্থ নি ল য়

৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা—৯ .

প্রকাশক :
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৯

মুদ্রক :
শ্রীসন্তোষকুমার ধর
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস,
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :
শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্য

বেঁধেছেন :
সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্,
১০, সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার প্রকাশিত হল। করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন-কালিদাস রায়-কুমুদরঞ্জন গোষ্ঠীর কোন কবির সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা এই প্রথম; কতদূর সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা পাঠকদের বিচার্য।

আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিভূতি চৌধুরী, শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী এবং সুসাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষের উৎসাহ এই গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। বন্ধুবর শ্রীচিন্ময় মজুমদার এবং শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদারের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি ভিন্ন এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব ছিল না এবং জ্যোৎস্না গুপ্তর।

ক্ষেত্র গুপ্ত
সিটি কলেজ
১৪. ১১. ৫৯

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থ লিখেছেন। এ উদ্যম প্রশংসাযোগ্য শুধু নয়, এর প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের সম্যক আলোচনা আবশ্যক, তাতে শুধু তাঁদের বুঝবার সুবিধা হবে এমন নয়, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগকেও বুঝতে পারা যাবে। বাড়ীর সোপানগুলোকে অতিক্রম না করলে ছাদে ওঠা সম্ভব হয় না। সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কেও এ কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যদি এ যুগের কাব্যের চূড়া হয় তবে অপেক্ষাকৃত ছোট কবিরা সেই চূড়ায় পৌঁছবার সোপানশ্রেণী। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যেও ছোট বড় আছে। বড়র রহস্যে পৌঁছবার উপায় আছে ছোটদের মধ্যে। এক জায়গায় ছোট বড় সমান, সেটা তাঁদের সামাজিক প্রেরণা, আর এক জায়গায় তাঁরা ভিন্ন, সেটা প্রতিভার অসাম্য।

মধুস্থদনের যুগ সম্বন্ধেও কথাটা প্রযোজ্য। এক জায়গায় মধুস্থদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন সমান—সেটা সামাজিক প্রেরণা, যার ফলে তাঁরা সকলেই মহাকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু মধুস্থদন যে সকলকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছেন তার কারণ প্রতিভায় তিনি আর সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন—ওটা তাঁর ব্যক্তিগত বিভূতি। তা হলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে সামাজিক প্রেরণায় সমকালীন কবিতে মিল থাকে, ব্যক্তিগত প্রতিভায় ধরা পড়ে কে ছোট কে বড়।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের মধ্যে সূত্রটাকে আরোপ করলে দেখতে পাই যে কথাটা এখানেও সত্য। রবীন্দ্রনাথ শাখা-প্রশাখাবহুল বিরাট বনস্পতি, পত্রপল্লবপূর্ণ শাখাগুলো যেন গ্রহান্তরে গিয়ে ঠেকেছে। আশেপাশে আছে এমন সব বৃক্ষ তুলনায় যারা অনেক ছোট—তাদের শাখা-পল্লব পার্থিব আকাশ ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে নি। কিন্তু কি বড় কি

ছোট সকলেই রস আহরণ করছে এক মৃত্তিকা থেকে। মাটির ভিতরকার রহস্য সন্ধান করলে ধরা পড়বে যে সেখানেও ছোট বড় আছে—কারো শিকড় স্বল্প প্রবিষ্ট, কারো শিকড় চলে গিয়েছে রসাতলে। সমালোচকের কর্ত্তব্য হবে এই সাম্য ও অসাম্যের রহস্যভেদ, সাম্য সমাজ প্রেরণায়, অসাম্য ব্যক্তিগত বিভূতিতে। বায়ুচারী লেখক ও সমাজনিরপেক্ষ লেখক দুই-ই আকাশকুসুমের মতো অলীক।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।. কুমুদরঞ্জনের প্রেরণা জুগিয়েছে পল্লীবঙ্গ, বিশেষ ক'রে রাঢ়ের পল্লী। তাঁকে পল্লীবঙ্গের কবি বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথকেও পল্লীবঙ্গ প্রেরণা জুগিয়েছে, মধ্যবঙ্গের পল্লী। এখানে তাঁদের মধ্যে মিলন। কিন্তু আবার অমিলটা কত দুস্তর। রবীন্দ্রনাথ পল্লীবঙ্গের প্রেরণাকে ক্ষণিকা কাব্যের এক পদক্ষেপে অতিক্রম করেছেন—পদক্ষেপ একটি মাত্র কিন্তু সে যে একেবারে দশকুশি ধাপ। অপরপক্ষে কুমুদরঞ্জন সারাজীবন ঐ ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন। মিল পল্লীবঙ্গের প্রেরণায়, অমিল ব্যক্তিগত বিভূতিতে। এই জন্যেই কুমুদরঞ্জনের পল্লীকাব্য ও ক্ষণিকা প্রেরণায় এক হয়েও ভিন্ন।

এখন রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ছোট কবিদের সম্যক আলোচনা হলে তাঁদের তো বুঝতে পারা যাবেই, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগকে বুঝবার সুবিধা হবে। ক্ষেত্রবাবুর উদ্যম প্রশংসনীয়, তিনি প্রত্যক্ষতঃ যে কাজে উদ্যত বস্তুতঃ তার চেয়েও বড় কাজ করছেন, তবে তিনি তা স্পষ্ট করে জানেন কিনা বলতে পারি না।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কবিশেখর কালিদাস রায় প্রভৃতির কাছে বাঙালী কাব্যপাঠক চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। (আমি ইচ্ছা করেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের নাম বাদ দিলাম। এঁদের সম্বন্ধে কিন্তু কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে, আর অন্য কারণেও এঁরা

পূর্বোক্ত গোষ্ঠী থেকে কিছু স্বতন্ত্র)। এঁরা দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠককে কাব্যরসের মোটা ভাতকাপড় জুগিয়ে এসেছেন—এক সময়ে এই কাজ করেছেন মঙ্গলকাব্য প্রণেতাগণ ও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস। রবীন্দ্র-কাব্যের রাজপ্রাসাদের আড়ম্বরে যাঁরা সঙ্কুচিত হয়েছেন, দূর থেকেই ফিরে এসেছেন, (অবশ্য দ্বারীকে উপেক্ষা ক'রে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখ্‌তে পাবেন সেখানে সকলের জন্যেই ব্যবস্থা আছে) তাঁদের জন্যে রাস্তার ধারে পর্ণশালায় মোটা অন্ন বিতরণ করবার ভার নিয়েছেন কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান প্রভৃতি। কৃতজ্ঞতার এ এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ—এঁদের কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্যের সঙ্গে নব্য বাংলা কাব্যের মধ্যে যোগরক্ষা ক'রে এসেছে। এঁরা না থাকলে দুই কালের কাব্যের মধ্যে যোগ আরো অনেক বেশি দুস্তর হ'য়ে উঠ্‌তে পারত। ইংরাজি শিক্ষার পূর্বযুগের কবিরা এখন এলে অনায়াসে রস-গ্রহণ করতে পারতেন এঁদের কবিতার। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকার উন্নাসিক মহলে এঁরা অবজ্ঞাত। আমার স্থির বিশ্বাস "অতি আধুনিক কবিতার" ওলাই-চণ্ডীর প্রতিমা যখন বিস্মৃতির জলে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখনো এদের বহুতর কবিতা বাঙালী সমাজকে আনন্দ দান করতে থাকবে। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত উন্নাসিকদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে কুমুদরঞ্জনের কাব্য যে আলোচনাযোগ্য মনে করেছেন তাতে করে তাঁর রসবোধের উদারতা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতার কারণ আছে বাঙালী পাঠকের।

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

সংশয়, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহ

On the whole this poetry before the 1914-18 war was optimistic, sentimental and inspired by the passing moment. But with the disintegration of the age-old assumptions about the nature of man and the universe, and with the collapse of optimism in war and unrest, there rose a fierce intellectualism, a literary revolt against the cult of progress, cosmic emotion, and subjectivity, accompanied by a search for impersonal concreteness and terseness of expression.

—*Geofrey Bullough : The Trend of Modern Poetry.*

॥ এক ॥

ঊনবিংশ শতকের নবম দশকে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম। বিংশ শতকের পঞ্চম দশকের সমাপ্তির মুখেও তাঁর সৃষ্টির উৎস রুদ্ধ হয় নি। নির্ঝর-কল্লোলে প্রাচুর্য নেই, চিহ্ন আছে। কুমুদরঞ্জনের উপরে তাই এ শতকের দাবি কম নয়। কিন্তু অঙ্কের হিসেবে হলেও কালধর্মের বিচারে বিংশ শতকের সূচনা ১৯০০ সালে নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পরিবেশ ও মননেই এই শতকের জন্ম। ১৯১৮ সালে কবির বয়স প্রায় ৩৬ বৎসর। জীবন-দৃষ্টির একটা বিশেষ ভঙ্গি ও আদর্শ এরই

মধ্যে তাঁর আয়ত্তাধীন হয়ে গিয়েছে। কাজেই বিংশ শতকের হয়েও তিনি ঊনবিংশ শতকের ধারাকেই বহন করে চললেন। আধুনিক কালের হলেও কুমুদরঞ্জন আধুনিক মনের নন।

বিংশ শতকে যে নূতন জিজ্ঞাসা, অবিশ্বাস, ক্লান্তি, হতাশা ও আর্তনাদ জীবন-চর্যায় দেখা দিল কুমুদরঞ্জন তা থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন কেবল কি ঐ ৩৬ বৎসরের বর্মের আবরণে? বিদেশী কবিদের মধ্যে অনেকের জীবন-চেতনাই তো মহাযুদ্ধের চার-বছরের ব্যবধানে দ্বিধা-বিভক্ত; এবং সে দ্বৈধ দুস্তর। তর্ক চলে যে, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" জীবনে যখন অজস্র ভাঙন মনে তখন তার ধাক্কা লাগবেই। বিদেশে অর্থাৎ পশ্চিম পৃথিবীতে সে আঘাত নিরেট বস্তুপিণ্ডের আর ভারতের নিভৃত পল্লীতে তার কম্পন শুধু বায়বীয় ভাবলোকের। পশ্চিমের কবিরা তাই এড়াতে চাইলেও পারতেন না। অগ্নিচক্ষু শ্যেনের মত অনেকে ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে ধ্বংসকে বরণ করেছেন, কেউ আবার ঘূর্ণিঝড়ের দাপট থেকে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় পালকহারা ভগ্নপক্ষ অস্তিত্ব বহন করে চলেছেন। সুদূর বাংলাদেশে এই ঝড়ের খবর এসেছিল। নিপুণ শক্তির সূক্ষ্ম পর্দায় তা আন্দোলন তুলতে দ্বিধা করে নি। কুমুদরঞ্জনের শক্তিতে সে নিপুণতা ও মনের পর্দায় সে সূক্ষ্মতা সম্ভবত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৫৫-৫৬ বৎসর। পঞ্চাশোর্ধ্ব বনস্পতির ঊর্ধ্ব শাখায় চাঞ্চল্য জেগেছিল। অবশ্য পাতালের ভোগবতী পর্যন্ত প্রসারিত মূল রসের সঞ্চয়ে বঞ্চিত হয় নি কোন দিন। তাই বিংশ শতক রবীন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করল, কিছুটা বিমর্ষও করল, দেখায় ও বলায় কিছু ভঙ্গিরও বদল হল। কিন্তু সংশয়ের শুষ্কতা পাতা ঝরিয়ে দিল না, অবিশ্বাসের আত্মগ্লানি ও যুগ-যন্ত্রণার আর্তি তার পেলব-মাধুর্যকে বিনষ্ট করতে পারল না। রবীন্দ্রনাথের শক্তি কুমুদরঞ্জনের নয়। কুমুদরঞ্জনের তৃণকুসুমে যে সরসতা

অব্যাহত, বনস্পতির ছত্রচ্ছায়াই তার অন্যতম কারণ; আর কারণ আপন ক্ষুদ্র স্বরূপে মাটির বুকের কাছে বাস করা।

একালের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের কবিতার যদি আদৌ কোন সম্পর্কই না থাকে, তবে সে আলোচনা অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে কোন রচনার মধ্যে কি নেই তার বৃথা অনুসন্ধানের আক্ষেপে সাহিত্য-সমালোচনায় কোন সিদ্ধান্তে গিয়েই পৌঁছানো যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মতে "বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে।"—(রাজসিংহ : আধুনিক সাহিত্য)। কুমুদরঞ্জনের কাব্যে কি নেই তার বিচার না করে, কি আছে তার আলোচনাই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। কিন্তু কুমুদরঞ্জন যে যুগে জন্মেছেন তাকে অস্বীকার করি কেমন করে? একালের লোক হয়েও তিনি কেন একালের কবি হলেন না, আর কোথায় একালের কাব্যের সংগে তাঁর রচনার পার্থক্য তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সমকালীন অন্যান্য কবিদের সংগে তুলনায় তাঁর কবি-চিত্তের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্যই এ কাল-পরিচয় অপরিহার্য।

যুগজীবন কবির রচনায় নানা দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে। অথবা কবি যুগজিজ্ঞাসার তরঙ্গোৎক্ষেপের মধ্যেও আপন মানস-দ্বীপে নিশ্চিন্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করেন। প্রথম ক্ষেত্রে যুগ-বিশ্লেষণ যে অপরিহার্য তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও যুগের পরিচয় প্রয়োজন। কবি কোন মন্ত্রে যুগতরঙ্গের আলোড়নের মধ্যেও

অবিচল তার সম্যক জ্ঞানলাভের জন্যই প্রয়োজন। মানুষের জীবনে ও মনে কতকগুলি শাশ্বত সত্য ও বৃত্তি আছে ঠিকই, কিন্তু যুগে যুগে তার রূপের যে পরিবর্তন ঘটে তাও বিস্ময়কর। চিরন্তন সাময়িকের বেশেই দেখা দেয়। অন্য কোন বেশ তার জানা নেই। সাহিত্য-বিচারের ভূমিকায় তাই যুগ-জিজ্ঞাসার আয়োজন। কবি-চিত্তের গঠন ও প্রবণতা অনুধাবনে যেমন এর গুরুত্ব, তেমনি গুরুত্ব মানুষের জীবনের ও মনের নতুন রহস্য, প্রশ্ন ও মূল্যবোধের দিক থেকেও।

কাজেই কুমুদরঞ্জন যে-কালের কবি, সে-কালের বহির্ধর্ম ও অন্তরের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

কুমুদরঞ্জনের গ্রন্থের ভূমিকায় কবি ও সমালোচক কালিদাস রায় সম্ভবত এ জাতীয় আলোচকদের সাবধান করেই বলেছেন, "যে জন্য কুমুদরঞ্জন মোহিতলালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—ঠিক সেই জন্যই কুমুদরঞ্জন বাঙালীর মর্মও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই জন্যই এক শ্রেণীর অর্বাচীন পাঠকদের কাছে কুমুদরঞ্জনের কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদা নাই। এই বিমানের যুগে বিশ্ব যাঁহাদের হস্তামলক, বিশ্বসাহিত্য যাঁহাদের নখদর্পণে, কিন্তু যাঁহারা দেহে বাঙালী হইলেও মনে বাঙালী নহেন—তাঁহারা বাংলার যাহা কিছু নিজস্ব সেই সমস্তকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। অবিমিশ্র বাঙালীমনের সৃষ্টি কুমুদরঞ্জনের কবিতার আদর তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশা করা ভুল। তাহা ছাড়া, যাহারা সত্যই ঘুমাইয়া আছে তাহাদের জাগানো সহজ। কিন্তু যাহারা ঘুমের ভান করিয়া শুইয়া থাকে—তাহাদের জাগানো সহজ নয়। এই প্রকৃতির পাঠকদের কাছে আমার বক্তব্য কিছুই নাই।"—(কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচায়িকা)। তবে এই প্রকৃতির পাঠকদের কাছে কুমুদরঞ্জনের কবিতার সম্ভবত কিছু বক্তব্য আছে। সেই বক্তব্যটিই বুঝে নেবার চেষ্টা আমরা আলোচ্য গ্রন্থে নানা দিক থেকে

করছি। আধুনিক চিন্তা-চেতনার পরিপ্রেক্ষিত যে কুমুদরঞ্জনের কবিতার আলোচনা ও বিচারেও প্রয়োজন, এমন কি অনিবার্য তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। আর "অবিমিশ্র বাঙালী মন" নামক বস্তুটি অষ্টাদশ শতকের পরবর্তীকালে কোন শিক্ষিত বাঙালীর অধিকারে ছিল কিনা ইতিহাসই তার বিচারক।

উনিশের শতকে বাংলাদেশে এক নতুন জীবনের উদ্ভব হয়েছিল। এ-জীবনে মধ্যযুগের গ্লানি হয়ত অনেকখানি জড়িয়েছিল, কিন্তু কর্মে ও চিন্তায় নতুনের দ্বারোন্মোচনেরও অভাব ঘটে নি। অর্থনীতির সম্পূর্ণ যন্ত্র-রূপায়ন হয় নি, হয় নি কৃষি-প্রাধান্য থেকে শিল্প-প্রাধান্যে রূপান্তর, কিন্তু বিচিত্র সমাজ-সংস্কারের কর্মযজ্ঞে বাঙালী-চিত্তের প্রসার দিগন্ত স্পর্শ করেছে। ইংরেজী শিক্ষার বাতায়ন-পথে শিক্ষিত সহরবাসী বাঙালীর মন বিশ্ব-চেতনার সামীপ্য অনুভব করেছে। জগৎ ও জীবনের এক অভিনব রূপ, মানুষ-মহিমার অচিন্ত্যপূর্ব ছবি, প্রত্যাশায় উজ্জ্বল নতুন ভবিষ্যৎ। পরিপ্রেক্ষিত হল বিপুল-বিস্তৃত, সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা চূর্ণ হল, জীবন-রাগিণী একতারার সরল মেঠো সুর ছেড়ে সপ্ততার বীণার বিচিত্র জটিল সুরে বাজতে লাগল। সমস্যা এ যুগেও ছিল, প্রশ্ন ছিল, বেদনারও অভাব ছিল না। কিন্তু সব মিলিয়ে এ যুগ সুস্থতার যুগ, বিশিষ্ট মানবাদর্শে বিশ্বাসের যুগ, ভবিষ্যৎ আশ্বাসের যুগ। এ শতকের সৌন্দর্যে অখণ্ডের বোধ—তাতে সংশয়-অবক্ষয়ের চিহ্ন বড় নেই, ধর্মবোধ মানব-সম্পর্কে এসে মধ্যযুগের তুলনায় নতুন স্বরূপ পেলেও অস্বীকৃত হয় নি।

কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকেই এই সুস্থ ও পরিপূর্ণ জীবন-বোধে নানা সংশয় ও ভাঙনের চিহ্ন প্রকট হয়ে ওঠে। যে "বড় ইংরেজের" শিক্ষা, রুচি, বিজ্ঞান-বিদ্যা ও কল্যাণ-বুদ্ধিতে আমাদের অচল শ্রদ্ধা ছিল,

বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাও ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে গেল ১৯০৫ সাল থেকেই।" কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ নবসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র য়ুরোপকে বিধ্বস্ত করল। লোভ-লোলুপতার, ধ্বংসের ও রক্তের মধ্যে আদর্শবাদের সমাধি হল, সভ্যতার মুখোস পড়ল খসে। ভবিষ্যৎ মনে হল অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্তমান মনে হল অর্থহীন। মানবিক মূল্যবোধে মৌল পরিবর্তন এল। যে মানুষের জয়গানে এককালে মুখর হয়ে উঠেছিল কবি-শিল্পী সমাজ, যে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন আকাশের নীলকে অনায়াসে স্পর্শ করেছিল, তাকে মনে হল পড়ো জমির ফাঁপা মানুষ—আসন্ন সর্বধ্বংসের মুখে যন্ত্রণাবিক্ষত অস্তিত্বের ভারবাহী—মুখে তার মন্ত্রোচ্চারণ, "Anihilation, anihilation, anihilation".

উনিশের শতকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিজ্ঞান-চেতনার আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ স্থানকালের বোধকে উল্টে দিল। চিরন্তন কালের বোধ নস্যাৎ হয়ে গেল। গ্রহজগতের নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়া নিখিল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অস্তিত্বের তুচ্ছতাকে প্রতিষ্ঠিত করল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানব-জীবন তথা জীবনমাত্রই বিশ্বপ্রবাহের "বাই প্রোডাক্ট" বা অপ্রয়োজনীয় আকস্মিক সৃষ্টি বলে পরিচিত হল এবং ভবিষ্যতের "কোল্ড ডেথে"র জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। পূর্ব শতাব্দীতে যে বিজ্ঞান-চেতনা মানবকল্যাণের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাণীতে মুখর ছিল আজ তা সংশয়ে কম্পিত, হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। ফ্রয়েডের চিন্তা সচেতন ভাবনাকে কৃত্রিম এবং মগ্নচৈতন্যকে সত্য বলে প্রচার করল। মানবের মনোরাজ্যের বিরাট এক অন্ধকার প্রদেশ আলোকোজ্জ্বল হল, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিতে তাকে পরিপূর্ণ দেখে সে শিউরে উঠল। অবশ্য যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিতে, চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্চর্য অগ্রগতিতে, ভোগ্য পৃথিবীর সীমা অনেক বেশি আয়ত্তাধীন

হয়ে পড়ায় বিস্ময় ও আনন্দের যে নতুনতর কোন জ্যোতি দেখা দিল না এমন নয়। কিন্তু ব্যবহারিকতার ঊর্ধ্বে উচ্চতর দার্শনিক চেতনায় এরা খুব গভীর অনুপ্রবেশ পেল না।

আশা-আনন্দ সম্ভাবনার দিক থেকে এযুগে সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। উনিশের শতকে পরিকল্পিত মার্কসীয় সাম্য-চিন্তার এই বাস্তব প্রয়োগে শোষণহীন, দারিদ্র্যহীন জীবনের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর কল্পনামাত্র রইল না। কিন্তু য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ রক্তপাতে বিমর্ষ হল ; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার সার্বিক অবলুপ্তির দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠল।

স্বভাবতই এ পর্বের জীবন-জিজ্ঞাসায় এই নতুন চিন্তা-চেতনার দোলা লাগল, কবিতা ভাব ও রূপে নতুন বাঁক ফিরল।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের চিন্তা ও উপলব্ধির ভাবতরঙ্গ এসে পৌঁছল ; তবে এই যুগের সর্বব্যাপী প্রভাবে "আধুনিক" কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি তিরিশোত্তরেই দানা বেঁধে উঠল। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর বৈরাগ্য, অন্তর্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা……।"

আধুনিক বাংলা কবিতা সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্র-ভাষ্যকে অস্বীকার করতে চাইল। কল্যাণবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করল, ধর্মবোধকে নির্বাসন দিল। পল্লী-প্রকৃতির প্রতি অতি-আকর্ষণকে বলল ফ্যাসান। আর নাগরিক জীবনের ক্লান্তি-অবসাদ, যন্ত্রণা ও বেদনাকেই সত্য বলে বরণ করে নিল। প্রেমকে স্থাপিত করা হল দেহকামনার বাস্তব

ভূমিকায়। নতুন দেবতা হলেন ফ্রয়েড এবং মার্ক্স। অনুভূতির আধিক্যের স্থানে মননের দীপ্তি প্রাধান্য পেল। সাম্যবাদী চিন্তা বিষয়বস্তু হিসেবে সমাদৃত হল। বিষয়বৈচিত্র্যে বিশ্বপরিক্রমা, প্রথাবদ্ধ উপমা-উৎপ্রেক্ষার পথ পরিহার, ভাষার জটিলতাজনিত দুর্বোধ্যতা, গদ্যছন্দের অধিক ব্যবহার, তর্ককণ্টকিত পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ, অভিনব চিত্রকল্প ও বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ আধুনিক কবিতার দেহ রচনাকে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করল।

এই ভাব-ভাবনার রাজ্য থেকে কুমুদরঞ্জন বিস্ময়করভাবেই দূরবর্তী আর এই রূপরচনার সঙ্গে যেন তাঁর নীরন্ধ্র অপরিচিতি। আলঙ্কারিক ভাষায় বলা যায়, কবি যেন যুগকোলাহলের মধ্যেও এক কোমল পেলব ধ্যানরাজ্যের স্বপ্নাবেশে নিশ্চিন্তভাবেই সুপ্ত। এ সুপ্তি পলায়নজাত নয়। পলায়নপর মানুষের পৃষ্ঠদেশ শত্রু-অস্ত্রে বিক্ষত থাকে। কুমুদরঞ্জন অক্ষতদেহ। আপন প্রাণশক্তির প্রবলতায় তীক্ষ্ণ শরাঘাতকে লাজবর্ষণে পরিণত করার মত ক্ষমতার অধিকারীও তিনি নন। আবার দীর্ঘস্থায়ী চিত্তদ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হবার পরিচয়ও নেই তাঁর কবিতায়। কাজেই কুমুদরঞ্জনের এ ভাব-রাজ্যকে মায়ারাজ্য বলে মনে হয়—স্বপ্নলোকের মৃদুতা, ক্ষণিকতা এবং অলীকতা এর সর্বদেহে। অথচ স্বপ্নাতুর মানুষের কাছে এ কতই সত্য।

কুমুদরঞ্জন এই স্বপ্নলোক থেকে যে শান্তিবারি বর্ষণ করেন তা মুহূর্তের মোহাবেশ জাগায়, সঙ্কটত্রাণ করে না। তাঁর কবিতা আমাদের গভীর জিজ্ঞাসাকে স্পর্শ করে না, আমাদের জটিল সমস্যাদীর্ণ চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে না, আমাদের সামনে নতুন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয় না।

॥ তিন ॥

কবিশেখর কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের সমাজ-চেতনা ও ইতিহাস-বোধের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "ইদানীং কাব্যবিচারে ইতিহাস-সচেতনতা ও সমাজ-সচেতনতা এই কথা দুইটির খুব প্রয়োগ দেখি। ইতিহাস বলিতে শুধু স্বদেশ-বিদেশের পুবাবৃত্ত বুঝায় না, পুরাণ ও ইতিহাস, নিজের গ্রামের ইতিহাস, নিজের বংশকুলের ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকেও বুঝায়। সে হিসাবে সোমনাথের কবির রচনায় ইতিহাস-সচেতনতা প্রচুর। আর সমাজ বলিতে কেবল তো ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, নগরের সৌখীন সমাজ, চা-কফির টেবিলের বা কলেজের লেকচারারদের বিশ্রামকক্ষের টেবিলের চারি পাশের সমাজ, শ্রমিক নেতাদের সমাজ বা কোন রাজনৈতিক সমাজকেই বুঝায় না,—যে সমাজে কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পালিত বর্ধিত হইয়া চিরজীবন বাস করিতেছেন—তাহাই কবির পক্ষে আসল সমাজ। সে হিসাবে কবির কাব্যে সমাজ-সচেতনতা খুবই প্রখর। এক সমাজের কবির পক্ষে অন্য সমাজের সচেতনতা থাকাই অস্বাভাবিক।"—(কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচায়িকা)। সমাজ-চেতনা সম্পর্কে আমার ধারণার পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। কবিশেখরের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। কুমুদরঞ্জনের সমাজ-চেতনাকে আমি প্রখর বলে মনে করি নি, তার অস্তিত্বেই আমার সন্দেহ আছে। তাতে কবির মর্যাদা-হানির আশঙ্কা নেই। তাঁর কবিতার স্বরূপ আবিষ্কারই সমালোচনার লক্ষ্য, কতগুলি কাল্পনিক লক্ষণের আরোপ নয়।

"আমাদের ভারত," "ভারত মহিমা," "দাসপর্ব," "বাঙালী", "জাগ্রত ভারত," "দাবী," "নমস্কার," "মায়ের পূজা," "বড়দিন",

"ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায় আরতি," "কঃ পন্থা" প্রভৃতি কবিতায় সমকালীন" ভারতবর্ষ এবং স্বদেশানুরাগের সূত্রে তার অতীত মহিমার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত আধুনিক মানবসভ্যতা বিষয়ে কবির চিন্তারও কিছু কিছু প্রতিফলন এদের মধ্যে ঘটেছে। এই কবিতাগুলির বিচারে কবির বর্তমান-বিমুখতার অভিযোগ কতটা যুক্তিসহ দেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশে কবির প্রথম যৌবনে ১৯০৫ সালে স্বদেশচেতনার প্রবল উচ্ছ্বাস জেগেছিল। ১৯২১ সালের আন্দোলনে ভারতব্যাপী তার সুবিপুল মূর্তির উজ্জীবন ভারতবাসীমাত্রের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বাদেশিকতা সমসাময়িক দেশবাসীর একটি সাধারণ মানস-সম্পদ। কবির চেতনায় তা বিশেষ করে কবি-জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল কিনা তাই-ই বিচার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কুমুদরঞ্জন ভারতের অতীত মহিমায় বিশ্বাসী। যদিও এ বিশ্বাস তাঁর কবি-বিশ্বাস কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কবি-বিশ্বাস এবং ব্যক্তি-বিশ্বাসে কিছু পার্থক্য আছে, এবং সেটি গুরুতর। ব্যক্তিগতভাবে নানা মতবাদ কবির থাকতে পারে অন্য পাঁচজন সামাজিক মানুষেরই মত। কিন্তু কবির নিগূঢ় অন্তরানুভূতিতে রূপ-চেতনার সঙ্গে তা সংযুক্ত হলেই তাকে কবি-বিশ্বাস বলে মেনে নেওয়া যায়। কুমুদরঞ্জন অতীতের মহিমা ও গৌরবের রাজ্যে খুব স্বচ্ছন্দ নন। তার কর্মবহুল ও বর্ণোজ্জ্বল বিচিত্র পটভূমির মধ্যে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। তাঁর প্রিয় পল্লীর বর্তমানই (বলা উচিত স্বপ্নের বর্তমান) তাঁর প্রিয়। পরিবারের পুরানো তৈজসে, চিঠির তাড়ায়, একজোড়া সেকালীন গহনায় তাঁর অতীতচারী রোমান্সরসপুষ্ট। তাই "ভারত মহিমার" বর্ণনা প্রাণহীন তথ্যচয়নমাত্র, আর "আমাদের ভারতের" রূপরচনায় ধর্ম ও পুরাণ কথার কিছু বিবৃতিধর্মী উল্লেখ—

এই ভারতে করে নি ভাগ, মোগল কি ইংরাজ,
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ।

নিজের জাতির কৃষ্টি রেখে গেছে উৎপীড়ক,—
নিভেছে আগ্নেয়গিরির উদ্গারি হীরক।
শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসি-বাঁশীর দেশ,
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ।

কবির স্বদেশপ্রেমের ধারণাটি খুবই অস্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্বন্ধে তিনি সহজেই বলতে পারেন—

ভারতের ধনরত্ন লইয়া যাহারা করিছে ফেরি
ক্ষতি কিছু নাই ; বিনিময়ে তারা হয়ে গেছে আমাদেরি।
সপ্তনদীর বন্যার জল প্রবেশ যেখানে লভে
এই ভারতের ভাণ্ডার চির প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী—
হরণ করেছে, বরণ করিতে করিবে না বেশী দেরী।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব-মৈত্রীর প্রভাব কুমুদরঞ্জনের এই চিন্তার উপরে স্পষ্ট। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে যুগে বৃটিশ-বিরোধিতার যে-রূপ আকাশ-বাতাসকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে রেখেছিল তার সঙ্গে কবিচিত্তের সম্যক সামীপ্য ঘটে নি। আর হিন্দুত্ববোধের আধিক্যে তাঁর বিশ্বমৈত্রীও যে রবীন্দ্রচেতনার সমকক্ষ গভীরতা ও অনিবার্যতা পায় নি তার প্রমাণ আছে "দাবী" কবিতায়। অমৃতের অধিকার হিন্দুর জন্মগত। যে ভাষায় সে কথা বলুক না কেন, যে দেশেই তার অবস্থান হোক "হিন্দু সে হিন্দুই আর কিছু নয় সে"।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে কবির আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটেছে "জাগ্রত ভারত", "নমস্কার", "মায়ের পূজা" কবিতায়। কবি এক বিচিত্র আদর্শবাদের ফলে অথবা ক্ষণিকের ভাবালুতায় হাজার

বছরব্যাপী দুর্গতি ও দারুণ নির্যাতনকে মসীবিন্দুর মত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলে অনুভব করেছেন; অধ্যাত্মবাদী অতীতের মধ্যেই ভারতের নবজাগরণ তিনি লক্ষ্য করেছেন। দেশসেবকদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদনে অবশ্য তাঁর কার্পণ্য নেই। তবে মাতৃপূজাই স্বদেশ চিন্তার চরম অবদান বলে তিনি মনে করেন।

সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতা সর্বাধিক আঘাত পেয়েছে "বড়দিন" কবিতায়। কিন্তু সেখানেও সুর অত্যন্ত মৃদু—

পুঞ্জিত পাপ যাহারা করিল জমা।
এবারও তাদের তুমি কি করিবে ক্ষমা?
তোমার নামের তারা কি মহিমা বোঝে?
মদোন্মত্ত তারা কি তোমাকে খোঁজে?

এর ক্ষীণকণ্ঠ কোমলতায় রবীন্দ্রনাথের "তুমি কি তাদের' ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল"র প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতার শেষে রবীন্দ্রনাথ দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু আরও কঠিন অভিজ্ঞতা ও দুঃখের মধ্য থেকে জাতি যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করল কুমুদরঞ্জন তখনও "ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি" জানিয়েছেন—

তোমরা যেতেছ ঘন-গৌরবে উচ্ছল মহিমায়,
মাঘী পূর্ণিমা যথা বসন্তে আহ্বানি চ'লে যায়।
তোমরা যেতেছ সাফল্যময় আনন্দে অনুরাগে,
যেমন দেউল করি' সমাপ্ত শিল্পী বিদায় মাগে।
শঙ্খ-ঘণ্টা-হুলুধ্বনিতে মুখর তোমার পথ,
গঙ্গার অবতরণ দেখিয়া চলে গেল ভগীরথ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ

শাসকের কল্যাণবুদ্ধি সম্বন্ধে ভারতবাসীর মোহ ছিল। তবে পাশাপাশি কিছু অভিযোগও শোনা যেত। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতায় ইংরেজদের প্রতি যুগপৎ ঘৃণা ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বড় ইংরেজ' 'ছোট ইংরেজ'-এর ধারণার কথাও মনে পড়ে। কিন্তু উনিশ শতকের সমাপ্তি থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সুর কিছু চড়তে থাকে। বঙ্গ-ভঙ্গ ও সন্ত্রাস-আন্দোলনের পথ ধরে বাংলাদেশে তা খুবই তীব্র হয়ে ওঠে; এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে নতুন স্বাধীনতা কামনার বন্যা আসে। কুমুদরঞ্জনের কবিতা কিন্তু এখনও উনিশের শতকের শ্রদ্ধা-বোধে (তাও আবার ঘৃণার সঙ্গে মিশ্রিত আকারে নয়) অবিচলিত।

আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জন খুব সরব নন। তবে "কঃ পন্থা", "বাঙ্গালী", "বন্যা", "ঝঞ্ঝা" প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মতামতের কিছু প্রকাশ আছে। যন্ত্রসভ্যতার বিভৎস দানবীয়তাকে তিনি ধিকার দিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে, তার সর্বসংহারী মূর্তিই তিনি দেখেছেন—মুদ্রার অন্য পিঠ দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গিয়েছে—

শুচি ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে আসিয়াছে অবসাদ,
এলো জঘন্য কদর্যতার সাধ।
সঙ্ঘাতে, প্রতিহিংসা লোকক্ষয়ে
জাতির স্ফূর্তি তৃপ্তি লুকায়ে রহে,
নরহত্যাই সবচেয়ে হলো লঘুতম অপরাধ।

এই সভ্যতার পতন হবেই। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা দুর্নিবার ঘূর্ণির বেগে অস্থি-মালার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝণৎকার রণিত করে, ম্যায় ভুখা হুঁ ডাকে ভূতলে গগনে চকিতে চমক লাগিয়ে আসবে। প্রাচীন মদগর্বী সভ্যতার মত আধুনিক দম্ভী শক্তিগুলির ধ্বংসও অনিবার্য।

হেন ঝঞ্ঝায উড়িয়া গিয়াছে গ্রীক,
রোমান কারথেজিনিয়ান পারসীক,
হয়তো উহারই আবর্তে হবে লীন
অমনি প্যারিস লণ্ডন বার্লিন,
স্টেলিনগ্রাডের রণ-আয়ুধের অনন্ত ভাণ্ডার।

"ঝঞ্ঝা" কবিতাটির ভাব-কল্পনা খুবই অস্পষ্ট। ঝড়ের কোন প্রাকৃত রূপ এ কবিতায় নেই। রবীন্দ্রনাথও "বর্ষশেষ" কবিতায় কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝামত্ত রূপের মধ্যে নতুনের আহ্বান শুনেছিলেন। কিন্তু ঝড়ের প্রাকৃত রূপের অতি তীব্র এবং ভাবোদ্রেককারী প্রকাশই কবিচিত্তে তার বিশেষ বাণীটি বয়ে এনেছিল। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ঝড় একান্তই রূপক, কোন বাস্তব প্রকৃতিরূপ নয। এ ঝড় রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে। এই ঝড়ে কখনো মানুষের বিরাট বিরাট শিল্পকীর্তি, গ্রন্থাগার, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয, আবার কখনো অত্যাচারী শক্তিদম্ভী সভ্যতার পতন ঘটে। কাজেই কল্যাণসাধক কবির কাছে ঝড়ের আবেদনটি কিরূপ? রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও কি দুঃখের মূল্যে, ধ্বংসের মূল্যে অনিবার্য নতুনকে বরণ করে নেবেন? মদগর্বী সভ্যতার ধ্বংসশক্তি হিসেবে তাকে আহ্বান করবেন? অথবা শান্ত সুসংহত জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লোপকারী হিসেবে তার রুদ্ররূপকে সংবরণ করতে বলবেন? শান্তরসের সাধক শেষ পর্যন্ত ঝড়কে নিবৃত্ত হবার প্রার্থনা জানিয়েছেন—

ঝঞ্ঝা তোমার ত্যজ ও বৈরিভাব
হউক পুণ্য নূতন জন্মলাভ।
আনো আনন্দ, অমৃতের হিল্লোল,
ঝুলন ঝুলাও, দাও হিন্দোল-দোল,
ভাসাও উজানে প্রেমের প্রদীপ কালো জলে যমুনার।

কবিতার এই অংশই মাত্র ভাবরসের কোমলপ্রবাহে এবং রূপচিত্রের অতিপ্রশান্ত সৌন্দর্যে কবির শিল্পী-মনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু কবি এই কোমল-মৃদুতায় অবগাহন করে ভুলে গেলেন ঝড়ের এই রুদ্ররূপ, যা ছিল তারও আকাঙ্ক্ষিত—

স্ফীত আমেরিকা অভিনব গর্ব্বে
ধূলি হয়ে যাবে ঝঞ্ঝার গর্ভে।

"বন্যা" কবিতাযও এই ভাবের দ্বিধা লক্ষণীয়। কবি অবশ্য বলেছেন, তিনি বন্যাকে ভালবাসেন। কিন্তু সে তাঁর গভীর হৃদয়ের কথা নয়। কবি যে বন্যাকে ভালবাসেন তা হল—"প্রেমের বন্যা ভাবের বন্যা।" কিন্তু এ কবিতায় ধ্বংসকারী সৈন্যবাহিনীর বলদৃপ্ত জয়ঘোষণাকেও বন্যার সঙ্গে উপমিত করা হযেছে। যে বন্যা "মুক্তির স্বাদ, ভক্তির সংবাদ" আনে তার সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর অভিযানের তুলনাই হয় না। অথচ এদের একই আসনে বসানো হয়েছে। ফলে এ কবিতার ভাব-চেতনা অস্পষ্ট এবং রূপনির্মাণ হয়েছে অসার্থক।

আসলে স্বদেশ-চেতনা ও যুগচিন্তামূলক এই কবিতাগুলিতে রসের উদ্বোধন ঘটে নি—কোথাও শব্দচয়নে ইতিহাস-পুরাণের অধিক উল্লেখে রচনা ভারাক্রান্ত, কোথাও নিরুত্তাপ বিবৃতি-বক্তৃতার প্রবহমানতা, আর ভাব-চিন্তার অস্পষ্টতা। নজরুলের উদ্দাম-উদ্দীপনা কুমুদরঞ্জনে নেই, ভাষা-ছন্দে সে উল্লাস এখানে যেমন একেবারে অনুপস্থিত, তেমনি অপ্রাপ্তব্য এমন কি সত্যেন্দ্রনাথের (আরও পূর্ববর্তী কালের হওয়া সত্ত্বেও) রাজনীতি-চিন্তার পরিচ্ছন্ন প্রগতিশীলতা।

কুমুদরঞ্জনের কবিমনের বাইরের মহলেই এদের স্থান, অন্দরমহলে নয়।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

অমৃত-ধারা

Rabindranath Tagore is a phenomenon. If Nature manifest in the even light of the sun, forsook the forms of fields and hills and trees, and flowered in words, that indeed were he. There has not been a greater literary force, or a greater force, a force like Nature's expressing itself in literature.

—*Buddhadeva Bose : An Acre of Green Grass.*

রবীন্দ্রসাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে, তাকে পরীর দেশ বললেও বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত

॥ এক ॥

মহৎ প্রতিভার আকর্ষণ এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে স্বকীয় জীবনবোধের তীক্ষ্ণ বিশিষ্টতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট নিজত্ব যদি কবির আয়ত্তে না থাকে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসা যে একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিক উপলব্ধিজাত, তাতে যে অপরের কোন অধিকার নেই লিরিক কবিতার এই কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কুমুদরঞ্জন এবং তাঁর অতিনিকট কবিগোষ্ঠীর সম্ভবত অজ্ঞাত ছিল। করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস রায় এবং কুমুদরঞ্জন স্বাভাবিক কারণেই এক গোষ্ঠীভুক্ত কবি-চতুষ্টয় হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের

প্রভাব এঁরা এড়াতে পারেননি এবং সম্ভবত চানও নি। সম্ভবত রবীন্দ্রমনন ও অনুভবের সীমাহীন বিস্তৃতি ও নিতল গভীরতা যে তাঁদের আয়ত্তের অতীত, তার স্থূল সরল ও তরল রূপই যে হবে তাঁদের অনুকরণে বাস্তব, এই বোধও বিলম্বিত ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদ রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনধর্ম নিয়ে। জীবন-প্রত্যয়ের কেন্দ্রগত ভাবোপলব্ধিতে অবিচল থেকেও যুগের পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন তিনি। ঊনবিংশ শতকের বিশ্বাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি হয়েও বিংশ শতকের যন্ত্রণারও এক অংশকে তিনি কাব্যভাষা দিয়েছিলেন যে আশ্চর্য নিপুণতায়, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। রবীন্দ্র-অনুকারীরা এই পরিবর্তনের বিদ্যুৎচমকে দিশাহারা, পরিবর্তমান তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা না করেই নিশ্চিন্ত।

এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়—"তাঁহাদের সকলেরই কবিপ্রতিভার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—যদিচ এ বিষয়ে কমবেশি আছে, যেমন কুমুদ-রঞ্জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব ন্যূনতম। রবীন্দ্রপ্রভাবের পরেই বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কুমুদরঞ্জনে ও কালিদাস রায়ে এ প্রভাব সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হইয়াছে, যতীন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব স্বল্পতম। কিন্তু এই চারজনের উপরেই পল্লীপরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ হইয়াছে। কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসিবার আগে সেই যে এক সময়ে জীবনের দীর্ঘকাল পল্লীবঙ্গে কাটাইয়াছিলেন, সেই স্মৃতি মানসপ্রতিমা গড়িতে তাহাদের প্রভূততম সাহায্য করিয়াছে। করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহন মনে মনে পল্লীবাসী ছিলেন, কালিদাস রায় এখনো আছেন, কুমুদরঞ্জন তো কায়মনোবাক্যে এখনো পল্লীবাস করিতেছেন। আধুনিক কবিগণের জীবনতন্ত্রে নগর একটি প্রধান উপাদান, সেইজন্য তাঁহাদের কাব্য জটিল ও অনেকাংশে দুর্বোধ্য,

(নাগরিক জীবনের রহস্যও জটিল ও দুর্বোধ্য)। পল্লীপরিবেশের উৎস হইতে প্রভাবিত বলিয়া ইঁহাদের কাব্য সরল ও প্রাঞ্জল।··· সাধারণভাবে ইঁহাদের কাব্যে প্রেমরসের স্বল্পতা। দাম্পত্য সম্পর্ককে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম বিকশিত হয় তাহার বিকাশ ও লীলা ইঁহাদের কাব্যে যথেষ্ট আছে—এদিকে ইঁহারা অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্র সেনের অনুগামী; কিন্তু যে প্রেম সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে না, আপনি আপনার নিয়ম রচনা করিয়া নরনারীর জীবনে ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়া বেড়ায়, সে প্রেমের অভাব এই সব কবির কাব্যে। তবে এ বিষয়েও কমবেশি আছে। যতীন্দ্রমোহন ও করুণানিধানে মাঝে মাঝে এ প্রেম দূরাগত জলন্ত উল্কার মত দেখা দিয়া থাকে, বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা এ গ্রহের অধিবাসী নয়, চলিয়া যাইবার মুখে একবার জ্বলিয়া গেল; কিন্তু কুমুদ মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কাব্যে এ প্রেম নাই বলিলেই চলে। এখন প্রেমের এই রূপটির অভাব তাঁহারা ভক্তিতে পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন।”—(‘বাংলার কবি’)।

বৈষ্ণব-ভাবনা, প্রেমচেতনার বিশুদ্ধি এবং প্রকৃতিপ্রীতির অতিরেক, সত্য-শিব-সুন্দরে অচল বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ধারাবর্ষণের মধ্য দিয়েই এদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-ভাবনায় সুগভীর মৌলিকতা ছিল। তার লীলা-রস সৌন্দর্যের আস্বাদে যেমন তিনি ছিলেন ব্যাকুল তেমনি তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানবরসের অনুসন্ধানেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু আলোচ্য কবিচতুষ্টয় বৈষ্ণব প্রেমের মাধুর্যের তুলনায় হরিভক্তিরসে চিত্ত সরস করে নিতেই চেয়েছেন। প্রেম কল্পনায় এঁদের মধ্যেও একটা দেহাতীত বিশুদ্ধির সুর অতি স্পষ্ট। রবীন্দ্র-কল্পনার প্রেমতত্ত্বের উপলব্ধি এঁদের মধ্যে না মিললেও বিহারীলাল থেকে শুরু করে প্রেম যেভাবে দেহভাবনা মুক্ত হতে থাকে, এবং রবীন্দ্রনাথে যেভাবে তা নিশ্চিত

প্রতিষ্ঠা পায়, তাকেই এঁরা প্রেমবোধের চরম বলে সংশয়াতীত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতি চেতনার ক্ষেত্রেও তাঁরা যে ধারার অনুকারী তার সূত্রপাত বিহারীলাল থেকে। রবীন্দ্রনাথে তা জীবন জিজ্ঞাসার মূলের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আশ্চর্য গভীরতা পায়। সে গভীরতা ও অনিবার্যতায় এঁরা কোনকালে পৌঁছুতে না পারলেও, রবীন্দ্রকাব্যের কাছ থেকে একটা শিক্ষা লাভ করেছিলেন—নগরসভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির শান্ত-কোমল রূপের সাধনাই কবিধর্ম। ফলে এ সাধনায় সর্বদাই চিত্ত উদ্বেলিত ও একাগ্র ছিল এমন মনে হয় না, কোথাও এই পল্লীপ্রকৃতির প্রতি ভালবাসায় "ফ্যাসান"-এর ঝোঁক আসে নি একথা জোর করে বলতে পারি না। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিত্রকল্প, উপমা ও রূপরচনারীতি, কবিতার দেহগঠনপদ্ধতি ও ছন্দকলা এঁদের প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল বলা চলে।

অথচ প্রায় সমকালের অপর কয়েকজনের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের চোখে জগৎ ও জীবনকে দেখবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের প্রয়াসের পটভূমিতেই উক্ত কবি-চতুষ্টয় বিশেষ করে কুমুদরঞ্জনকে চিনে নিতে হবে।

॥ দুই ॥

কুমুদরঞ্জনের সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন,—প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮), করুণানিধান (১৮৭৭), যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৮), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২), মোহিতলাল (১৮৮২), যতীন্দ্রনাথ (১৮৮৭), কালিদাস রায় (১৮৮৯), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)। এঁদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্র-মোহন, করুণানিধান, কালিদাস রায়কে নিয়ে গঠিত ভাব ও চিন্তার ঐক্যসূত্রে বিদ্ধ গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অপর

কয়েকজন কবির কণ্ঠে রবীন্দ্র-জীবনবোধের বহিঃস্থিত কাব্য-ভাবনার স্বর ধ্বনিত। এঁদের রবীন্দ্র-সমালোচনায় আসলে ব্যঞ্জিত হল আপন স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ দাবি। এঁদের কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার নানা বিকাশের নিশ্চিত সূচনা এবং প্রমথ চৌধুরী, মোহিত লাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলামে এই বিদ্রোহের সোচ্চার অগ্রনায়কত্ব।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা কাব্যসংসারে স্বল্প পরিচিত,—মুষ্টিমেয় কয়েকটি সনেটের রচয়িতা। কিন্তু এক বিপুল নব সম্ভাবনার পথিকৃৎ তিনি। বাংলা কবিতায় প্রমথ চৌধুরী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মননের দাপ্তি বিচ্ছুরণে তিনি অনুভূতির দ্রুতির রাজ্যে বিপর্যয় আনেন, লঘু-চপল ব্যঙ্গকৌতুকে রোমান্টিক ভাবালুতার অতিবিস্তারের পক্ষচ্ছেদ করেন।

নয়ন গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল
বুলবুলের সুরে আমি বেঁধেছি সেতার
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল।
যে সুর পশিযা কানে চোখে আনে জল
সে সুর বিবাদী যেন মোর কবিতার
মম গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল।
বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব।
আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার
চুটকীতে রাখি সব আশা ভালবাসা
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার
সুরে তালে মিল আছে, দুই ভাসাভাসা।

হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞানকর্মকে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কবিতাপাঠে উপলব্ধ হয়। রূপরচনার কী অদ্ভুত নিষ্ঠা তাঁর রচনায়, চিত্রকল্পে শিথিলতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, আর শব্দচয়নে সংস্কৃত-লৌকিকের বিচিত্র আলিঙ্গন আধুনিক কবিতার রূপায়ন-বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস বয়ে আনে।

মোহিতলালের আঙ্গিকে ব্যক্তিত্বের বজ্রকঠিন লৌহকবচ। এ আবরণ কিংবা আভরণ উনিশ শতকের ক্লাসক সংহতির অনুসারী। কিন্তু ভাবকল্পনায়, বিশেষ করে প্রেম-সম্পর্কের নব-তাৎপর্য-আবিষ্কারে, তিনি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটনে এক অভিনব ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর প্রাণদীপ্ত দেহবাদী চেতনা রবীন্দ্র-কল্পনার অশরীরী প্রেমানুভূতিকে অস্বীকার করল। তান্ত্রিক সাধকোচিত ইন্দ্রিয়লোকের সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয়িত অঙ্গীকারে সন্ন্যাস ও ত্যাগের আদর্শ পরিত্যক্ত এবং ধিক্কৃত হল।—

জীবনের সুখদুঃখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো।
যাতনার হাহারবে গান গাই,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু উগ্র ওই সোমরস ঢালো আরো ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো।

যতীন্দ্রনাথের নশ্বরতার ধারণা এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনতৃষ্ণা একান্তই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সত্য—জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তগম্য বিষয়। এই দুঃখবাদের মূলে কোন দুজ্ঞেয়তার চেতনা নেই। দুজ্ঞেয়তা, অসীমতা, রহস্য-দ্যোতনা, ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতা, প্রকৃতি-প্রীতি যতীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট

করতে পারে নি ; আর পারে নি বলেই তিনি জড়বাদী এবং দুঃখবাদী এবং রোমান্টিকতা-বিরোধী।—

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ;
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা।
চটক বা চখা কী জানে প্রেমের ? বকে কি শিখাবে ধর্ম ?
সহজ স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবনমর্ম !···
খাদ্যে-খাদকে বাদ্যে-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়্ ঋতু-ছলে ষড়্ রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য !···
শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

আর নজরুল সৌন্দর্যের স্বপ্ন থেকে রণাঙ্গনে স্বেচ্ছা নির্বাসিত। লাঞ্ছিত মানবতার কল্যাণ কামনায় তাঁর হাতের বীণা দুধারী তরবারিতে পরিণত।

কে বাজাবে বাঁশি ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ননির্যাস !

সৌন্দর্যের সব পিপাসা কণ্ঠে নিয়েই জ্বালা, নেশা আর উন্মাদনার সঙ্গীত রচনায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হয়। উচ্চ চিৎকারে আকাশকে বিদীর্ণ করে তিনি বিদ্রোহের তূর্য হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এই তৃষ্ণাদগ্ধ কণ্ঠের গানে তাই কেবলই হাহাকার।

রবীন্দ্র-অনুজ কবিসম্প্রদায়ের সঙ্গে অতি আধুনিক কাব্যধারাকে এঁরাই যুক্ত করেন। "কল্লোল" ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভাব ও রূপের এরাই সেতুবন্ধ।

এঁদের অনেকেরই সমকালীন কবি সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রঅনুসারী ও অতিক্রম-প্রয়াসীদের থেকে সযত্নে আপন দূরত্ব বজায় রেখেছেন। লঘুতরল কল্পনা-বিলাস এবং সাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার আশ্রয়ে তিনি আপনার স্বতন্ত্র ভাবজগৎ গড়তে চেয়েছেন।

এই একই কালের কবি কুমুদরঞ্জন। তাঁর "নূপুর" এবং মোহিত-লালের "স্বপন পসারী" প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। কুমুদরঞ্জনের "অজয়" এবং যতীন্দ্রনাথের "মরুশিখা" প্রকাশিত হয় একই বছরে, পূর্ব বছর নজরুলের "বিষের বাঁশী" এবং মোহিতলালের "বিস্মরণী"র প্রকাশকাল। অথচ এঁদের মধ্যে কবি-ধাতুতে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। এই ব্যবধান সত্ত্বেও এঁদের তুলনা না করে থাকা যায় না, কালগত নৈকট্যহেতু। এই পার্থক্যটুকু এখানে অতি সংক্ষেপে নির্দেশ করার চেষ্টা করা হল। জীবনদৃষ্টি ও রূপবোধের উৎসে এই পার্থক্য বলেই কুমুদরঞ্জনের কবিতার প্রতিটি ধারার সঙ্গে এঁদের তুলনা টেনে আনার চেষ্টা হয় নি।

॥ তিন ॥

রবীন্দ্র-কেন্দ্রী ভাব ও রূপনেমীতে নিরন্তর আবর্তিত হয়েছেন কবিচতুষ্টয়। কেন্দ্রের সত্যবার্তা তাঁদের কবিতায় প্রতিফলিত নয়, সে কথা বলেছি। এ প্রতিফলন সম্ভবও ছিল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁদের কি বিপুল পার্থক্য! এ পার্থক্য ভাব-উপলব্ধির গভীরতা-অগভীরতার প্রশ্নে নয়। সেখানে যে পার্থক্য আছে তাকে তো স্বীকার করেই নিয়েছি, এ পার্থক্য জাতের, ধর্মের—কাব্যরসসৃষ্টির দু'টি স্বতন্ত্র মহলের। অথচ সাহিত্যকর্মের দিক থেকে এঁদের কবিতাও লিরিক

এবং রবীন্দ্রসৃষ্টির স্বগোত্রীয় ; কিন্তু মহৎ প্রতিভাকে কোন গোত্র-চিহ্নে সীমিত করা যায় না। বিবর্তনের ধারায় সে-ধারাকে লঙ্ঘন করেই এঁদের আবির্ভাব। কবির নিজের ভাষায়, "সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামকা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেণ্ট্রিফ্যুগাল'—তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন।"—(পাগল : বিচিত্র প্রবন্ধ)। বিহারীলাল-সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-অক্ষয় বড়াল-দেবেন্দ্র সেনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করলে তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণেই বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক হয়েও অস্বাভাবিক। বর্তমানের পাঠকসাধারণের কাছে রবীন্দ্ররসাস্বাদন অভ্যাসে পরিণত হলেও উনিশের শতকে সমালোচকদের কাছে এবং উনিশ শতকী মেজাজের পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি অসহনীয় ছিলেন। সমকালীন অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তির রবীন্দ্রকাব্যবোধের অসামর্থ্যের কারণ এর মধ্যে মিলবে।

এই কারণেই আমার মনে হয় কুমুদরঞ্জনপ্রমুখ কবি-চতুষ্টয়ের উপরে রবীন্দ্রপ্রভাবের আধিক্য নিয়ে আমরা যে আলোচনা করে থাকি তা একান্তই বহিরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা কাব্যের যে ইতিহাসের ধারা তার প্রবাহে স্থাপন করলেই এঁদের কাব্যরসের সম্যক সৌন্দর্য আস্বাদ করা যাবে। উপকরণ প্রসঙ্গে বা প্রকৃতিবোধে রবীন্দ্রনাথের যে অনুসরণ তা বাইরের দিক থেকে, অন্তরের রসধর্মের দিক থেকে নয়। আর ভাষাশিল্পে তাঁর প্রভাব অনতিক্রম্য বলেই সত্য।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "তাঁহাদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে যাহা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তুক নয়, অতি প্রাচীন ; প্রচুর রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য হারায় নাই ; রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যে যখন ক্রান্তিপাত ঘটিতেছিল, তখন ইঁহারা ও ইঁহাদের মতো কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্যসংস্কার সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন খণ্ডে আজ যে ব্যবধান ইঁহাদের কাব্য তাহাকে একেবারে দুস্তর হইতে দেয় নাই।...সেকালের জগৎ হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি একালে পদার্পণ করিলে অনায়াসে এই সব কবির কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন।" —(বাংলার কবি)। এই কবিগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ অক্ষয় বড়াল-সুরেন্দ্র মজুমদার-দেবেন্দ্র সেনের সম্ভবত কিছুটা দ্বিজেন্দ্রলালেরও এবং এর কোন কোন সূত্র প্রাচীন বাংলা কবিতার রাজ্য পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্যের শপথ বাণী উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হলেও, রবীন্দ্রনাথকে এঁদের কবিচিত্ত পাশ কাটাতে চেয়েছে এবং যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে নি ; এবং ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বড় কৌতুক হল এই যে "কল্লোল" এবং পরবর্তী-কালের তথাকথিত রবীন্দ্র-বিরোধী কবিগোষ্ঠী কিন্তু রসের রাজ্যে রবীন্দ্রকবিতার অনেক নিকটবর্তী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাখির ডানায় সুনীল আকাশের যে বার্তা এনেছিল তা থেকে এই রবীন্দ্রঅনুগামীরা একান্তভাবেই বঞ্চিত ছিলেন, অথচ রবীন্দ্রোত্তীর্ণ হবার যে সাধনা আধুনিক কবিদের—জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী-সুধীন দত্তের—তাতে পাখির ডানার সঞ্চালন অনুভব করা যায়। রবীন্দ্র-অনুগামীরা বাংলা গীতি কবিতার পূর্বতন ধারাকেই সত্য বলে

গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে এই পূর্বতন ভাববৃত্তের দিক থেকে ছিলেন কেন্দ্রাতিগ (সেন্ট্রিফ্যুগাল) তা তাঁরা বোঝেন নি। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই কেন্দ্রাতিগ শক্তি পূর্বতন বৃত্ত থেকে বিচ্যুত হয়ে যে নববৃত্ত রচনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল পরবর্তী তরুণ কবির দল রবীন্দ্র-প্রভাবকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেও এ সত্য বুঝেছিলেন।

কিন্তু সে সত্যটির কি কোন বাস্তবরূপ আছে, না তা কেবলই উপলব্ধিগম্য ব্যাপার ?

বিষয়বস্তু এবং ভঙ্গি ও রূপরচনা-সাপেক্ষ রবীন্দ্রনাথের যে দান বাংলা কাব্যে নতুন কাব্যবৃত্ত রচনা করে তুলেছিল তা হল—উপলব্ধি ও চিন্তার অতি তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অতলান্ত গভীরতা, বিচিত্র জটিলতা। প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষের রাজ্যে, পরিবারজীবন থেকে মুক্ত-চেতনার আকাশ কামনায়, অহৈতুক বিষাদের সুরমূর্চ্ছনায় তা আমাদের উপস্থিত করে দিল। বস্তু থেকে ভাবের সার্বভৌমত্বে, প্রতিটি শব্দে ব্যঞ্জনাধর্মের প্রয়োগে, অনুভূতির সঙ্গে অল্পাধিক মননের সংযোগে এই নববৃত্ত রচিত হল। তুলনামূলক ভাবে সুরেন্দ্রনাথ-অক্ষয়বড়াল-দেবেন্দ্র-নাথে ব্যক্তি-মুদ্রণ সত্ত্বেও ভাবচিন্তার মধ্যে সর্ব-সাধারণের অধিকারের বিস্তার ছিল। গভীরতা কোথাও কোথাও থাকলেও জটিলতা ও বিচিত্রতার ছিল একান্ত অভাব। মননের দীপ্তির একান্ত অনুপস্থিতি, প্রত্যক্ষ বস্তু রূপের স্বীকৃতি, ব্যঞ্জনার সামান্যতা, সুদূর কামনার স্বল্পতা এঁদের কাব্যরসকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তুলেছিল। এ পার্থক্য রোমান্টিসিজম-ক্লাসিসিজমের নয়। কারণ শেষোক্ত কবির দল রোমান্টিক সমাজভুক্ত বলেই গণ্য হবেন। বিহারীলাল দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী হলেও, রবীন্দ্র-উদ্ভাবিত বৃত্তের অস্পষ্ট ও অচেতন পূর্বাভাস তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের ভাব-চিন্তা ও রূপায়নবৃত্তির যে

অভিনবত্বের কথা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি তা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতি-কবিতাকে যে অত্যুচ্চ নবীন স্তরে স্থাপিত করেছিলেন, সেখান থেকে এঁরা বাংলা কবিতাকে স্খলিত করেন নি। কিন্তু কুমুদরঞ্জন প্রমুখদের কবিতা ভাব-চিন্তা ও রূপায়নবৃত্তির ঐক্য সত্ত্বেও পূর্বতন স্তরেই বাস করেছে।

॥ চার ॥

আসলে কুমুদরঞ্জন প্রমুখদের যে আয়োজন তা সাহিত্যের খাস-মহলের নয়; এবং সুরেন্দ্রনাথ-অক্ষয়বড়াল-দেবেন্দ্রনাথ-কামিনী রায় এমন কি নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্রের অবদানও ঠিক খাসমহলের নয়। আধুনিক খ্যাতনামা কবির দল এই উচ্চ রস-রসিকতার স্তরে উন্নীত, নবীনদেরও সেই সাধনা। অপরপক্ষে জন-সাধারণের সাহিত্য-রসতৃষ্ণা নিবৃত্তির দায়িত্ব এতকাল কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানরাই বহন করে এসেছেন। "উচ্চাঙ্গ কাব্যরসবোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্য পর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠক সমাজের রস-জীবনযাপনের মোটা অন্নবস্ত্র জোগাইবার ভার ইঁহাদের মতো কবির উপরে এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের নিমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই; কিন্তু রবাহূত অনাহূতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমন তো হওয়া উচিত নয়। ইঁহাদের উপরে মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার। সেকালে মোটা অন্ন ও রাজভোগে এমন প্রভেদ করা হইত না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পালা উদার হস্তে যে অন্ন বিলাইত, তাহাতে রাজা ও রাখালের সমান রুচি ছিল। মহাজন পদাবলীতেও অন্নে বাছবিচার ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কেবল সমাজে জাতিভেদ শিথিল হয় নাই, কাব্যেও অন্নের জাতিভেদ ছিল না।

সেকালে কেবল সমাজে নয়, রসের ক্ষেত্রেও একান্নবর্তী ছিল। একালে সমাজে ও সাঁহিত্যে একান্নবর্তিতা লোপ পাইবার মুখে। সাহিত্যের খাসমহল হয়তো আয়তনে বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে বহিঃপ্রাঙ্গণের আয়তনও বাড়িয়া গিযাছে। সেখানে যাহারা পাতা পাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? একশ বছর আগে মধুস্থদন যখন খাসমহলের ভার গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সাধারণে রস বিতরণের ভার ছিল ঈশ্বরগুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের উপরে। একালেও প্রয়োজন আছে।"—(প্রমথনাথ বিশী: বাংলার কবি)। কুমুদরঞ্জন প্রমুখ কবিরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহিত্যক্ষেত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

কবিজীবনী

প্রতিদিনের কথাবার্তা চিঠিপত্র দেখাসাক্ষাৎ কাজকর্ম শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই—তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো তাহা কবির আয়ত্তের অতীত।

—রবীন্দ্রনাথ ঃ সাহিত্য।

॥ এক ॥

কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে সম্পর্ক কতখানি এ নিয়ে পণ্ডিত সমালোচকদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেণী আছে। একদল এই সম্পর্ককে স্বীকার করেন এবং কাব্যবিচারে কবির জীবন-বিশ্লেষণ একরূপ অনিবার্য বলে মনে করেন। অপর একদল এই সম্পর্ককে আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে কবির ব্যক্তিগত জীবনচর্যা যে খাতে প্রবাহিত হয় কাব্যরচনার উৎসভূমি তা থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। কাব্যসৃষ্টি করে যে সেই অস্তিত্বের গভীরে অবস্থিত কবি-আত্মাকে জীবনের প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির কাব্যের সঙ্গে স্রষ্টা কবি-আত্মার সম্পর্ক অতি-নিকট। কিন্তু "কবিরে পাবে না তাঁহার জীবন-চরিতে।"

কবির জীবনের ঘটনাবলীর সূত্রে সূত্রে মিলিয়ে তাঁর কাব্যকে বিচার করা উচিত এমন পদ্ধতিতে আমিও বিশ্বাস করি না। তবে কবির যে আত্মা কাব্যসৃষ্টি করে সে স্বয়ম্ভূ নয়। তার সঙ্গে কবি-জীবনের সম্পর্ক

আছে; এবং সে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। জীবনরসেই সে-আত্মা নির্মিত ও পুষ্ট। তবে জীবনের অতিপ্রত্যক্ষ প্রতিফলন সেখানে মিলবে কিনা তা নির্ভর করে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভা ও চিত্ত-প্রবণতার বৈশিষ্ট্যের উপরে। কোন কবির কবি-আত্মায় ব্যক্তি-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনের মাত্রাধিক্য থাকতে পারে—যেমন মধুসূদনের; আবার কোন কবির ক্ষেত্রে তা এতই অপ্রত্যক্ষ, বর্ণালীসহযোগে আবৃত যে অনুসন্ধানের অতীত হয়ে উঠতে পারে। তাই কবির কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে দেশ-কালের মত কবির কবিজীবনের পরিচয় গ্রহণও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের জীবনের পূর্ণ তথ্য সম্বলিত চিত্ররচনায় বর্তমান লেখক অপারগ। তার জন্য তথ্য-সঞ্চয়ে যে প্রাচুর্যের প্রয়োজন তার একান্ত অভাব। তবে আশা করা যায় গবেষণা-কুশল লেখকগণ কুমুদরঞ্জনের জীবৎকালেই তথ্য সঞ্চয়ে অনেকখানি কৃতকার্য হবেন। সে বিষয়ে আমার অক্ষমতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করে বলব, আমি সে-জাতীয় তথ্য সমৃদ্ধ জীবনীর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকব।

॥ দুই ॥

কুমুদরঞ্জনের জীবনের যে ঘটনা সর্বজ্ঞাত তা যেমন সরল, তেমনি স্পষ্ট; যদিও তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বর্ধমান জেলার উজানী বা কোগ্রাম অজয় নদের তীরে অবস্থিত। এই গ্রামই কবির জন্মভূমি। ১৯০৫ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন। মাথরুন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ঐ বিদ্যালয়ই তাঁর একমাত্র কর্মক্ষেত্র। উক্ত বিদ্যালয় তাঁর স্বগ্রামের অতি নিকটবর্তী। দীর্ঘকাল হল অবসর গ্রহণ করে স্বগ্রামেই বাস করছেন। তিনি

চিরকাল সমকালীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সংস্পর্শের বাইরে রয়েছেন। সাহিত্যিক মনোজিৎ বসুর নিকটে লিখিত একটি চিঠিতে ১১।১।৪৬ তারিখে স্বয়ং কবি নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করা হল।

"১। ১২৮৯ সালে ফাল্গুন মাসের ১৮ই আমার জন্ম—কোগ্রাম মাতুলালয়ে।

২। বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র মল্লিক—কাশ্মীর মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ছিলেন—৫০ বৎসর কাশ্মীরে ছিলেন। বাড়ী আসিয়া ১৩৪৪ সালের দশহরার দিন মারা যান—আমার মাতৃদেবীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে। আমার পিতৃকুল পাণ্ডিত্য, তেজস্বিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য প্রসিদ্ধ।

ছেলেবেলায় মানুষ হইয়াছি মাতুলালয়ে—মাতামহীর স্নেহে, মাসীমাদের কাছে।

আমাকে ভালবাসিতেন বাবাই বেশী কিন্তু আমি মা বলিতেই অজ্ঞান। তেমন পুণ্যময়ী ভক্তিমতী স্নেহময়ী জননী পাওয়া সত্যই দুর্লভ—লিখিয়াছিলাম—

মাগো আমার পুণ্যময়ি
তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার
এই করুণা এই মমতা।
জনম জনম যা হয়েছে
জনম জনম হবেও মা,
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার,
তোমার কাজল, তোমার চুমা।

৩। ছেলেবেলায় শান্তশিষ্ট ছিলাম না। দুর্বল হইলেও গাছ হইতে

দুই বার পড়িয়া এবং সাঁতার দিতে গিয়া ডুবিয়া যমরাজের সঙ্গে প্রায় চোখোচোখি করিয়া আসিয়াছি।

পড়াশুনো করিতে বিশেষ ভাল লাগিত মনে হয় না—পাটিগণিত, জ্যামিতি নামেই ভয় পাইতাম। চৌবাচ্চার নল ও জলের অঙ্ক অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হইত—কেন এসব অঙ্ক কষায় বুঝিতে পারিতাম না।

খেলা অনেক রকম করিতাম এবং সঙ্গীও ছিল বহু।

ছেলেবেলায় আমি গল্পের বই পড়িবার মত পাই নাই। ছিলও কম। মহাভারতের শ্রীবৎস উপাখ্যান ইত্যাদি বাড়ীতে পাঠ হইত, তাহাই শুনিতাম, বাড়ীতে অনেক সময়ই হরিকথা হইত, সেই সব শুনিতাম। ভক্তমালের গল্প, বীর দ্রোণের গল্প এসব শুনিযা মুগ্ধ হইতাম। বাউল গান, যাত্রা, কথকতা, খেপার গান প্রভৃতি প্রায়ই হইত, তাহাই আমার ভাল লাগিত। মেঠো গান যা রাখালেরা গাহিত, তা খুবই ভাল লাগিত—চণ্ডীর পালা—রামপ্রসাদের গান ঐ পালায় যাহা গাহিত তাহা বড় সুন্দর। একটু বড় হইয়া আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলি শুনিয়াছিলাম। উহা মন্দ লাগে নাই।

বাবা মা দুজনের কাছেই মার খাইতাম, কারণ মাতামহী ও মাসীমারা অতিমাত্রায় আদর দিতেন—একেবারে 'আদুরে গোপাল' ছিলাম। সর্বদা ১০।১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁদের কোলে কোলে ফিরিতাম—মাটিতে নামিতাম না—সেইজন্য দুষ্টামি করিতাম ও মার খাইতাম।

শৈশবে আমি গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকের প্রিয় ছিলাম, বহু লোকের গভীর স্নেহধারায় আমি পুষ্ট—এত আশীর্বাদ—এত শুভেচ্ছা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

৪। আমি প্রথম গ্রামের পাঠশালে হাতেখড়ির পর পড়া শুরু করি, পণ্ডিত মহাশয় খুব ভালবাসিতেন। তারপর বাড়ীতে আমাকে

পড়াইতেন আমার মায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক যিনি বিখ্যাত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরে হইয়াছিলেন—তিনিই আমাকে কবিতা লিখিতে শেখান ও উৎসাহ দেন—তাঁর কাছেই ইংরাজী পড়িতে শিখি। আমি ১১।১২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় Century School-এ ভর্তি হই, এখানে আমি ২।৩ বার প্রথম প্রাইজ পাই—এখনকার তৃতীয় শ্রেণীতে 3rd class-এ উষানাথ সেন (পরে Sir হন) আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি বয়সে ছোট ও দেখিতে আরও ছোট বলিয়া ক্লাসের সকলে আমায় স্নেহ করিত। F. A. পাশ করি Ripon College হইতে, B. A. পাশ করি City College হইতে। বি-এ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক পাই ১৯০৫ সালে। ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে অধ্যাপকগণ খুবই স্নেহ করিতেন। হেরম্ব মৈত্রেয়কে আমি বড় ভয় করিতাম, তিনি বড় পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ক্লাসের যেখানেই বসি এড়াইতে পারিতাম না—সেইজন্য অনেকে আমাকে কাছে বসিতে দিতেন না, পাছে তাহাদিগকেও পড়া ধরেন। এফ. এ. পড়ার সময় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গণিত পড়াইতেন—তেমন অসম্ভব শক্তি-সম্পন্ন অধ্যাপক দেখি নাই—তিনিই অঙ্কশাস্ত্রকে কাব্যের ন্যায় মধুর করিয়া দিলেন, আমাকে বাক্যবাণে দিন দিন জর্জরিত করিয়া অঙ্ক শিখাইলেন, অনুরাগী করিলেন—এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আমি দেখি নাই। অধ্যাপক ললিতকুমার, অধ্যাপক সুরেশ ঘটক (পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট) আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমাকে দীর্ঘকাল চিঠিপত্র দিতেন।

৫। বাবাকে ৫ বৎসরের ছেলে রাখিয়া আমার পিতামহী মারা যান। শুনিতে পাই তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। মরিবার সময় ভাবী পুত্রবধূর জন্য আপনার সমস্ত গহনা, বস্ত্রাদি, খেলনা, পুতুলের বাক্স, এক খেলাইবার কড়ি সাজাইয়া রাখিয়া যান। উহা আমার মাতৃদেবী সব পাইয়াছিলেন। দিদিমার আমিই সর্বস্ব ছিলাম, ত্রিবেণী

গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া তিনি আমাকে ৭।৮ টাকার কেবল মাটির পুতুল কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমি যাহা চাইতাম, তিনি তাহাই দিতেন এবং নানা অন্যায় আব্দারের জন্য মায়ের কাছে মার খাইতাম।

৬। কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি ১০।১২ বৎসর বয়সে—কোগ্রামে আমার সেই ছেলেমানুষী কবিতাই আদর করিতেন, আমার মাসীমারা এবং গ্রাম্য-গৃহিণীরা। আমি পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া তখন আর কোন কবিতার খবরই জানিতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, বাউল, ফকিরদের গীত'ও রাখালদের গানই আমার প্রিয় ছিল।

কলেজ-জীবনে প্রথমে Wordsworth-এর কবিতাই আমাকে কবিতার প্রকৃত রূপ যেন দেখাইল। ইংরেজী অন্য কবিতা বিশ্রী লাগিত, সর্বাপেক্ষা বিশ্রী লাগিত—Rule Britannia, rule the waves, এবং Britannia needs no bulwark. তারপর ইংরেজ বড় কবিদের সঙ্গে পরিচিত হই। Kipling-এর সহস্র দোষ সত্ত্বেও আমার ভাল লাগিত—বেশ বলিষ্ঠ কবিতা, স্থানে স্থানে ভক্তির ক্ষীণ ইঙ্গিত আমাকে মুগ্ধ করিত। তাঁর Proseও ভালবাসিতাম। ইংরেজী সাহিত্যের তিনটি মেয়েকে আমি ভালবাসি—Ophalia, Little Nell, আর Lucy Grey.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে দেরিতে পরিচয় হয়। তার আগে বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কীর্তন গান প্রথম যেদিন শুনি—আমার মনে হইল ভগবান ঠিক এই সুরেই বাঁশি বাজাইতেন। তাহারি কিছু মধুরতা কীর্তন গান আত্মসাৎ করিয়াছে। দেবেন্দ্র সেনের 'মলিন হাসি', 'নীরব বিদায়', 'বিজয়ী' প্রভৃতি কবিতা আমায় মুগ্ধ করিত, গোবিন্দ দাসের কবিতা খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আত্মীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সৌহার্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ

একদিন বোধ হয় আদর করিয়াই কবি কুমুদরঞ্জন বলেন, তখন সবে কবিতা লিখিতেছি—ইহা আমার জীবনকে যেন রঞ্জিত করিয়া দেয়, মনে হইল তবে সত্যসত্যই কবি হইব।

তারপর যখনই রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি, পরিতৃপ্ত হইয়াছি এবং স্নেহে ও প্রশংসায় ধন্য হইয়াছি। আমি 'ভক্তমাল', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'পদকল্পতরু' ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি—ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকৃষ্ণের কথায় সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে—একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পাইয়াছি।

'নব্যভারতে' যখন আমার প্রথম কবিতা বাহির হয়, তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে (class IX) পড়ি। আমার সর্বপ্রথম বই 'শতদল' তারপর 'বন-তুলসী', তারপর 'উজানি' 'একতারা' 'বীথি' 'বনমল্লিকা' 'নূপুর' 'তূণীর' 'অজয়'। আর ছাপা হয় নাই। ৬।৭ বৎসরের কবিতা জমা আছে—ছাপা হইবে। সালগুলি মনে নাই, অনেক বই out of print। বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় আমি সব রসই পাইয়াছি। ভগবান 'রসো বৈ সঃ' এটা যেন জানিতে পারিয়াছি। 'অজয়'কে আমার ভাল লাগে কেন জানি না, বোধ হয় জন্মান্তরের সৌহার্দ্য। তার ধূসর চর, তার বন্যা সবই আমায় আকর্ষণ করে। পল্লী মাঠ ঘাট বাট, বৃহৎ বনস্পতি ফল ও ছায়াতরু, এমন কি তৃণ গুল্ম আমার পরিচিত গ্রামবাসী বলিয়া মনে হয়। গাছ কাটিলেই মাঠ যখন ফাঁকা হয়, আমার ব্যথা লাগে। বর্ষাকাল, মেঘলা আকাশ, দুর্যোগ রাত্রি, জ্যোৎস্না রাত্রি, ভোরের আকাশ ও মাঠ ভালবাসি, গ্রামের পাখিগুলিকেও ভালবাসি।

কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না, লিখিবার জন্য নির্জনতার দরকার হয় না। সহস্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি। নদীতে বন্যা

বা জোয়ার আসার মত কবিতা লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আসে। আমি কবিতা গড়ি না। তারা রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মত ফোটে।"*

কবি-বন্ধু শ্রীকালিদাস রায় তাঁকে "বাউল বৈরাগীদের অঞ্চলের মানুষ, সাধক কবি লোচন দাসের পাটের প্রহরী" বলে উল্লেখ করেছেন। কবির জীবনের আরও একটি ঘটনার কথা বলেছেন শ্রীকালিদাস রায় যা তাঁর স্বভাবের উপরে গভীর আলোকপাত করে। "বার বার অজয় তাঁহার ভদ্রাসনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তবুও সেই অজয়তীর কিছুতেই ছাড়িলেন না। বিগত বন্যায় অজয় তাঁহার ঘরবাড়ি সব নিশ্চহ্ন করিয়া ভাসাইয়া গলাইয়া তলাইয়া দিল—তিনি তাঁহার ভিটায় তাঁবুতে বাস করিতে লাগিলেন—তবু পুত্রপরিজনদের আবেদন-নিবেদনেও অজয়তীর ছাড়িয়া গেলেন না।" শ্রীকালিদাস রায় তাঁর কবিতা-রচনা বিষয়ে একটা সহজ ঔদাসীন্যের কথাও বলেছেন। কাব্যদেহ সংস্কারের দিকে লক্ষ্য না দেওয়া এবং ভুল সংশোধনের ব্যাপারেও উৎসাহের অভাব, নিজের রচনা সংগ্রহ করে রাখার আগ্রহহীনতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কলকাতার অনেক সাহিত্য-সেবীর সংগেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। কবির স্বভাব সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন সূত্র থেকে যা শোনা গেছে তার মধ্যে কোথাও কোন দ্বিধা বা অসঙ্গতি নেই। এমন অমায়িক মধুর ব্যবহার খুব সুলভ নয় বলে তাঁরা একবাক্যে বলেছেন। বাংলা প্রবাদ "মাটির মানুষ" কথাটি সম্ভবত এই ধরনের মানুষদের লক্ষ্য করেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল। বর্তমান লেখক তাঁর কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা কিছু জানতে চেয়ে তাঁকে এক পত্র দেন। এই চিঠির উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন তা সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বচ্ছ; "আমার কবিতা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি নাই, তবে অধিকাংশ কবিতায়ই

*"কথাসাহিত্য"-কুমুদরঞ্জন মল্লিক সংবর্ধনা সংখ্যা থেকে সঙ্কলিত।

আমার নিজের কথা ও ঘরের কথা বলিয়াছি।" এবং সম্ভবত নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর আর কিছু বলবার নেই। তাঁর কথা বলবার ভার তিনি কবিতার উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল—শতদল (১৯০৬), বনতুলসী (১৯১১), উজানি (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বীথি (১৯১৫), বীণা (১৯১৬), বনমল্লিকা (১৯১৮), নূপুর (১৯২২), রজনীগন্ধা (১৯২৭), তূণীর (১৯২৮), চুণকালি (১৯৩০), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮)।

॥ তিন ॥

কুমুদরঞ্জনের জীবনী বিষয়ে যথোপযুক্ত তথ্য উপস্থিত করতে পারি নি। কিন্তু তাঁর অজস্র কবিতা পড়ে কবির কবিপ্রাণের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে এই সামান্য তথ্যও আশ্চর্য সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রথমত। কবির জীবন এবং কবিপ্রাণ (যা কাব্যসৃষ্টি করে) অতি নিকট সম্বন্ধে বদ্ধ।

দ্বিতীয়ত। কবির এই প্রাণ বাল্য-কৈশোরের লীলায়, যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের কর্মে, বার্ধক্যের বিশ্রামে অজয়-উজানীকে জড়িয়ে জড়িয়েই আপনাকে সৃষ্টি করেছে। রঙীন দিগন্তকে অস্বীকার করেছে যৌবনে, বাস্তব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ফিরেও তাকায় নি বার্ধক্যে, নগর জীবনের বহুবিচিত্র কর্মচাঞ্চল্য তাঁর ভাল লাগে নি; এমন কি সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রে যে সব আন্দোলন কলকাতা সহরের বুকে নিত্য তরঙ্গিত তার আবর্তকেও তিনি মুহূর্তের জন্য কামনা করেন নি। অথচ তাঁর নামের সঙ্গে অন্য যে তিনজনের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, যাঁদের কবিতায় পল্লীপ্রেম তাঁর রচনার তুলনায় নেহাৎ কম নয়, তাঁদের জীবনঘটনা

একান্তই অন্যরূপ। করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহন ছিলেন প্রধানত কলকাতাবাসী। শ্রীকালিদাস রায় এককালে গ্রামে শিক্ষকতা করলেও দীর্ঘকাল কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ব্যক্তিগত জীবনে অজস্র সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কুমুদরঞ্জন সহরবাসের কথা ভাবতে পারেন না, এমন কি বন্যায় বাস্তুভিটে ডুবে গেলেও নয়। এ কেবলমাত্র প্রকৃতি-প্রীতি থেকে আসে নি। পল্লীপ্রীতির সঙ্গে স্বগ্রাম-প্রীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে এর মধ্যে বিজড়িত হয়ে গেছে। লক্ষণীয় তাঁর কর্মস্থলও আপন গ্রামের অতি নিকটবর্তী।

তৃতীয়ত। তাঁর কবি-বন্ধুরা কেউ সমালোচক, কেউ বা সম্পাদক। কলকাতার বুকের সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু কুমুদরঞ্জন এ সব কিছু থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। কবির সরল সহজ অমায়িক চরিত্রের নির্বিরোধীভাবের সঙ্গে এই মনোবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আরও নানা কবিতার মত "পল্লীশ্রী"তে এই মনোভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

মূর্খ গরীব নাম-হারা মোর মা হয়েই তুই থাকলি মা।
সব দিকে আমি ছোট ব'লে তুই আগলিয়ে কোলে রাখলি মা।
পাঠাবি কোথায় নাই সৌরভ,
তুলিবি কোথায় নাই গৌরব,
পরে নিলে না তো ঘরে রেখে দিলি তাইতো আমারে পাগলি মা।

চতুর্থত। কবির কর্মজীবন একান্ত সরলরৈখিক। ১৯০৫ সালে বি. এ. পাস করে যাঁরা গ্রাম অঞ্চলে প্রধান শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন তাঁদের আদর্শবাদ একালে বিস্ময়কর বলে মনে হবে। বৃহত্তর এবং অনেকের মতে মহত্তর কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ যে কুমুদরঞ্জন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন একথা সহজেই ভেবে নেওয়া চলে। একদিকে আদর্শবাদ, স্বগ্রামপ্রীতি, অন্যদিকে উদ্যোগহীনতা কবিকে একাজে প্রণোদিত করে

থাকবে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে অন্তত পুস্তকব্যবসায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে আপন আর্থিক জীবনকে স্বচ্ছল করে তোলা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা যা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক কুমুদরঞ্জনের চরিত্রে তা ছিল অসম্ভব। নিরীহতম কর্মব্রত 'শিক্ষকতা' যেন তাঁর সহজাত বৃত্তি। এই নিরীহ আদর্শবাদ ও কর্মোদ্যোগের অভাব তাঁর সমস্ত রচনার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত।

পঞ্চমত। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় জীবন সম্বন্ধে আসক্তি ও নিরাসক্তির দ্বন্দ্ব নয়, একটা আশ্চর্য-সহজ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। কবির ব্যক্তিগত জীবনচর্যার কয়েকটি দিকের যে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণব-বাউল মানসিকতার সহযোগের মধ্যেই এই চিত্তবৃত্তি গড়ে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম পৃথিবীকে মায়া বলে অস্বীকার করে না। জীবমাত্রে তা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের চেতন অংশ অনুভব করে। মানবীয় প্রীতি ও প্রেম সম্পর্কের উদ্গতির মধ্য দিয়েই কৃষ্ণভজনার প্রকৃষ্ট পথ সে খুঁজে নেয়। কুমুদরঞ্জন যে প্রকৃতি ও জীবনে সৌন্দর্য এবং আনন্দ উপভোগ করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই একটা নির্লোভ পবিত্রতা এবং হরিমুখীনতা অনুভব করেছেন তাতে তাঁর বৈষ্ণব ধর্মপ্রাণতাই জয়যুক্ত হয়েছে।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

তৃণ-কুসুম

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি' বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।

—রবীন্দ্রনাথ : স্ফুলিঙ্গ

স্রোতস্বিনী কহিলেন, 'বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য করি না বলিয়া আমাদের কার্যের গৌরব অল্প একথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী স্নায়ু অস্থিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষ-দেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন।

—রবীন্দ্রনাথ : পঞ্চভূত

॥ এক ॥

কুমুদরঞ্জন বড় কবি নন, কিন্তু তিনি কুকবি নন, অকবিও নন। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় তাঁকে বলা যায় minor কবি।

কিন্তু তাঁর কবিচিত্তের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি একান্ত কেন্দ্রচ্যুত নয়। সত্যেন্দ্রনাথে কবিচিত্তের এই কেন্দ্রটি প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য। বিচিত্র বস্তুর দিকে তাঁর আকর্ষণ, তাঁর আয়োজন নানা রসসৃষ্টির। কিন্তু তাঁর প্রতিভায় সেই বিশিষ্ট ধাতুর অভাব যা বিচিত্র বস্তুর মধ্যে ঐক্যের সূত্র প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর কবিতায় শুধু "সর্ব বিদ্যা বার্তা বিধি দেখিতে দেখিতে গড়ে ওঠে গীতে"। নজরুলের কবিচিত্তের এই কেন্দ্রটি কিন্তু বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ চিৎকারে নয়, সংগ্রাম ও ক্লান্তি, সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ও সমাজচেতনার মধ্যে তাঁর অন্তরের দ্বিধাদীর্ণ আর্তিতে। যতীন্দ্রনাথের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় দুঃখবাদে আর প্রমথ চৌধুরীর বক্র নাগর চাতুর্যে এবং রোমান্টিকতা-বিরোধী মার্জিত মননে।

কুমুদরঞ্জনের কবিহৃদয়েও এমনি একটি কেন্দ্র আছে। তাঁর আয়োজন খুব বিস্তৃত নয়। বহু বিচিত্র বস্তুর প্রতি ধাবিত হন নি কবি। হয়ত এই কারণেই কবির চিত্তের মূল প্রত্যয়টি সহজেই আবিষ্কার করা যায়। কবিমনের এই জাতীয় বিশেষ কেন্দ্রসত্যের অভাবে কেউই বড় কবি বলে গণ্য হবেন না ঠিকই, কিন্তু কবি-জীবন-বৃত্তের কেন্দ্র থাকলেই তিনি বড় কবি, মহৎ কবির পর্যায়ে উঠবেন না।

কুমুদরঞ্জন প্রথমত গ্রামবাংলার কবি। এবং এই গ্রাম্য প্রকৃতি ও মানুষের অবস্থায় গত আটশত বৎসরেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি, অন্তত কবির মনের জগতে এই অপরিবর্তিত স্থিতিই একমাত্র সত্য। বাংলা দেশের গ্রাম-প্রকৃতির রূপ রুদ্রের সাধনা করে না। সেখানে প্রকৃতি এবং জীবনের নিস্তরঙ্গ সমতাল। অজয়নদে মাঝে মাঝে বন্যা আসে না এমন নয়, কিন্তু তার উদ্দাম স্রোত কবির রক্ত প্রবাহকে উন্মাদ করে তোলে না। পাখির মধ্যে কাক, টুনটুনি আর ফিঙে, ফুলের মধ্যে ভুঁইচাঁপা, জুঁই, ঘাসের ফুল, ঝিঙাফুলের প্রতি

কবির আকর্ষণ। খরগোস, প্রজাপতি, শুয়োঁপোকার রাজ্যে তাঁর সহজ বিচরণ। সহরজীবনের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র মোহ না থাকলেও রিক্সার টুংটাং শব্দ মন্দ লাগে না; সে কি কেবল ক্ষুদ্র বলেই নয়?

এ বিষয়ে কুমুদরঞ্জনের নিজের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। "উজানি" কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস। সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।" আবার ঐ কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন, "মহাকবি কবিকঙ্কণ তোমার উজানির গুণগৌরব গাথা তোমার খুল্লনা, ধনপতি, শ্রীমন্তের অপূর্ব্ব কাহিনী অমর সঙ্গীতে তোমায় শুনাইয়াছেন। আজ তোমার ক্ষুদ্র কবি তোমার ক্ষুদ্র উজানির ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা তোমায় শুনাইবে"। এ কেবল "উজানি" কাব্যের ভূমিকা নয়, কবির সমগ্র কবিতাবলীর মুখবন্ধ।

একটি কবিতায় "ছোটর দাবী" প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কবি। কবিতাটির প্রথম স্তবকে রূপ-দৈন্য চোখে পড়ে—

ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী দাবিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটর গতি বড় যে জল গাবিয়ে চলে।
অতি-বড়র তুচ্ছ যা, তাই
ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়র অট্টহাসি ছোটর কণা নয়ন-জলে।

কথাগুলি বিবৃতির মত মনে হয়, কিন্তু এগুলি কবির প্রাণের কথা—প্রাণ-কেন্দ্রের কথা। ছোট বস্তুর সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। ধানের একটি শিষ এবং শিশিরের একটি বিন্দুই কবির প্রীতি-স্নিগ্ধ হৃদয়-স্পর্শে অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত ঐ শিশির বিন্দুকে নীলাকাশের অনন্ত প্রসার আপন ছায়াপাতে ধন্য করে না। কুমুদরঞ্জনের কাছে ঐ জলকণিকা আপন ক্ষুদ্র অস্তিত্বের স্বরূপেই সুন্দর। কবির হৃদয়টিও

ঐ ধানের শিষের মতই, একটি শিশির-কণাকেই ধরে রাখতে পারে, বৃহৎ সমুদ্র বা নীলাকাশের অসীমতার সে নাগাল পায় না। সামান্যেই তাঁর আনন্দ, ক্ষুদ্রের রূপেই তাঁর তৃপ্তি। 'ছোটর দাবী' আসলে কুমুদরঞ্জনের কাব্যবোধেরই আত্ম-ঘোষণা। কিন্তু এ ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠে চিৎকার নেই, কারণ সমকালীন ও সমবয়সী কবিদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন সর্বাপেক্ষা মৃদুকণ্ঠ।

'ছোটর দাবী' কবিতাটির আরও কিছু বিশ্লেষণ করলে কবিচিত্তের এই বিশেষ প্রবণতা রূপনির্মিতির ক্ষেত্রেও কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ মিলবে। কুমুদরঞ্জন অনেক সময়ে সমসাময়িক অন্যান্য কবির মত (এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়) ইতিহাস পুরাণের প্রসঙ্গ কথার সাহায্যে কাব্যদেহ গঠন করতেন। কিন্তু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক রস তাঁর কবি-মেজাজের পক্ষে একান্তই পরদেশী বলে তাতে কচিৎ সার্থক হতেন। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় ইতিহাস-পুরাণের মহিমান্বিত বস্তুর ঘনঘটার তুলনায় ক্ষুদ্রের নম্র দীনতারই জয় ঘোষণা করা হয়েছে। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের তুলনায় গুহকের মিত্রতার গৌরব, কুরুক্ষেত্রের মেদিনী-প্রকম্পিত-গর্জন, ধ্বংস ও রক্ত স্রোতের মধ্যে বিদুরের ক্ষুদের মাহাত্ম্য, চণ্ডীর সিংহবাহিনী মূর্তি অপেক্ষা রামপ্রসাদের বালিকা কন্যার বেশ ধরে বেড়ার ধারের আবির্ভাবকেই প্রাণের ভালবাসার স্পর্শে জীবন্ত করেছেন কবি। তাঁর দৃষ্টিতে—

ভুলতে পারি সারনাথ এবং নালন্দার সে ধ্বংসটিকে,
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে।
হাজার হাজার মূর্তি তাঁহার
উহার কাছে মানে যে হার।
পূর্ণতা দেয় বিরাট ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে।

'ভৃত্য' কবিতায়ও পৌরাণিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের উল্লেখ রোমান্সরস যা ইতিহাস-রসের বিচিত্র, গম্ভীর ও বর্ণোজ্জ্বল রাগিণী না বাজিয়ে একটি পারিবারিক প্রীতিরসের স্নিগ্ধ সামান্যতায় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে—

মনুরে আমিই মানুষ করেছি, সহিয়াছি আবদার,
কোলে করি' আমি কান্না ভুলানু সেদিন 'মান্ধাতার'।
রামভদ্রের হামাগুড়ি দেখে হাসিয়া হয়েছি খুন
'দাদা' বলে মোরে গরব বাড়ালে বালক ভীমার্জ্জুন।

এই মনু-মান্ধাতা, ভীম-অর্জুন নামেই সেকালের, আসলে আমাদের সংসার জীবনে নিত্য এদের সাক্ষাৎ মেলে। সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু প্রীতিরস-স্নিগ্ধ একটা অকপট নৈকট্য এ কবিতাকে অনেকাংশে আস্বাদ্য করে তুলেছে।

'দীনতার আশ্রমে'ও কবি-মানসের এবং শিল্প-রচনার একই পরিচয় বহন করছে। নিশ্চিন্ত কবি জীবন-সায়াহ্নে দীনতার আশ্রমে আশ্রয় পেয়ে ধন্য। সেখানে ছিন্ন চাটায়ের শয্যা, মাটির প্রদীপের মিটিমিটি আলো। 'নবপ্রাতে' সূর্যের 'নব তেজ লাভ' করে ওঠার উল্লেখ থাকলেও, ম্লানরবির দিনশেষের নিশাযাপনের আয়োজন এত নিবিড় যে নবজাগরণকে আদৌ সত্য বলে বিশ্বাস হয় না। শ্রীবৎস-চিন্তারা এখানে রাজকীয় বেশ পরিত্যাগ করে কাঠুরিয়া বেশে ঘুরে বেড়ায়—

কুবেরের নয়, এখানে বিরাজে—বিদুরের ভাণ্ডার।

এবং কবি স্থির বিশ্বাসী যে কুবের নয়, ঋষ্যশৃঙ্গের কঠিন ব্রহ্মচর্য, দুর্বাসার দুর্বার ক্রোধ এবং কপিলের অতন্দ্র তপস্যা নয়, নারায়ণ যখন আসেন বিদুরের কুটিরেই তার পদপাত ঘটে। কঠিন দুর্বার অতন্দ্রের প্রতি তাই তিনি উৎসুক নন। দীনতার আশ্রমে কবি মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের "জীব ও জাতির জীবনের দিব্য অভ্যুদয়", "অমৃতের সন্ধান",

"অদূর কালের গতিপথ" লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এ ভ্রম—মায়া। কবি নিজেও বলেছেন—

এত সমারোহ—একি মায়া, ভ্রম প্রতারিত করে আঁখি ?

জনঘন পথ এখানে চিহ্ন রাখতে পারে না। কারণ—

দেখিতে দেখিতে তৃণ তায় ফেলে ঢেকে।

এবং এই তৃণশীর্ষে ছোট্ট ফুলটি যখন ফুটে ওঠে, অমৃতসন্ধানের গৌরব ও দুঃসাধ্য পরিশ্রম কুমুদরঞ্জনের প্রাণে আর কিছুমাত্র সাড়া জাগাতে পারে না। তাই—

স্বর্গ যাবার সব পথ যায়, এই আশ্রম ধরি'
পঙ্গু আমি—সে পথকে প্রণাম করি।

তিনি যে পথ বেছে নেন বৈষ্ণব তত্ত্বে তাকে দাস্যভক্তের পথ বলে। কিন্তু তত্ত্বটি কুমুদরঞ্জনের কাব্যপ্রাণের কেন্দ্রের সঙ্গে অদ্বয়বন্ধনে বাঁধা বলেই এর রূপসৃষ্টিতে সহজ চিত্তের আন্দোলনটি সরল চিত্রকল্পে সার্থক হয়ে ধরা দেয়—

কি পরিতৃপ্তি! চূড়া হওয়া চেয়ে নূপুর হওয়াই ভালো।

ক্ষুদ্র ও ক্ষণিকের প্রতি কুমুদরঞ্জনের আকর্ষণ তাঁর কবি-চিত্তের কেন্দ্রীয় সত্য। প্রায় সর্বত্রই তাঁর ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিতে এর প্রমাণ আছে। "ক্ষণের সঙ্গী"দের মুহূর্তের মৃদু পরিচিতি, তারপর চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া তাঁর হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তোলে। মরুর পথে বনের ফুলেল হাওয়া, ঘোমটা-ঢাকা মুখের একটু হাসি, শিস দিয়ে শ্যামা-পাখির উড়ে যাওয়া, ছড়িয়ে পড়া কদম্বরেণু তাঁকে মোহাবিষ্ট করে,—

পলাতক ওই আগন্তুকের দল,
নিমেষ মাঝে আলাপ ক'রে যায়,
ঠাঁই-ঠিকানা কিছুই নাহি বলে
ভিড়েই তরী নিরুদ্দেশে যায়।

কিন্তু সেই ক্ষণিকের সঙ্গীদের পেছনে কবি-মন নিরুদ্দেশ যাত্রা করে না। অসীমের অভিমুখে নিরুদ্দেশ যাত্রার শক্তি তাঁর ডানায় নেই। তিনি শুধু মুহূর্তের স্মৃতিগুলি নিয়ে ম্লান ও সরস মাল্য রচনা করেন—

স্মৃতি বেছে নিল কিরে
গোলাপগুচ্ছ, চম্পক ফেলি' ছোট আকন্দটিরে ?

আবার—

ভুলেছি জলসা বাগুভাণ্ড, নৃত্য-গীতের জাঁক।
মনে পড়ে শোনা সুদূর চুনারে, সাঁঝে শেয়ালের ডাক।

কবি এই 'স্মৃতির খেয়াল' দেখে কখনো অবাক হন—

বিস্মিত হই, হই যে অবাক—স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ ঢেকে মুছে দেয়, ছোটখাটো ছবি রেখে
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা—কেমনে এমন ঘটে ?
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি অটুট চিত্রপটে।
কারে কি যে দেয় দর ?—
শুকায় বারিধি বড় বড় নদী বহে যায় নির্ঝর।

আবার কখনো ক্ষণিক-পরিচিতির 'পথের-দাবী'ই স্মৃতির দ্বার দিয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। রেলে যেতে প্লাটফর্মে ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কোথায় ভিখারী বুড়ী খুজে পায় নি, কোথায় ফল কিনে দাম দেবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল, কোথায় প্রতিশ্রুতি দিয়েও শীত-কাতর বালককে এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্র দেওয়া হয় নি, সেই সব সামান্য কথার শোভা-যাত্রাই আজ পথের দাবী হয়ে দেখা দেয়—

দেখিব বলিয়া কথা দিয়া কোথা না দেখে এসেছি চ'লে,
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি কাহারে কি দিব ব'লে।

আজ দুর্যোগে ব্যথা পাই প্রাণে,
তারা যেন আসি' হাত ধ'রে টানে,
বুঝিতে-পারিনে এবার তাদের ফিরাব কিসের ছলে।

এই ছোট কথা, ছোট ব্যথায় কুমুদরঞ্জনের চিত্তের পত্রপুট পূর্ণ। আর এদের কথা বলাতেই কবি-প্রাণের উল্লাস।

॥ দুই ॥

এবারে এমন কয়েকটি কবিতার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে যেখানে বৃহৎ ও মহৎ বস্তু কিংবা ঘটনা, ব্যক্তিত্ব কিংবা পরিবেশের দিকে কবিচিত্ত আকৃষ্ট। সোমনাথের মন্দিরের প্রতি 'ব্যক্তি' কুমুদরঞ্জনের আকর্ষণ অতি গভীর। কিন্তু 'কবি' কুমুদরঞ্জনের আকর্ষণের স্বরূপ অবশ্য বিচার্য। সোমনাথের মন্দির নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। ভারত-ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তিপ্রাণতা এই কবিতাগুলির সচেতন রূপ-নির্মিতির উৎস বলে মনে হয়। এই কবিতাগুলিকে অবলম্বন করে তিনি প্রাচীন ইতিহাসের পথে পথে যে পরিক্রমা করেছেন তার পেছনে কবির সচেতন শিল্প-বুদ্ধি যতটা সক্রিয়, কবি-চিত্তের গূঢ়তম প্রদেশের জাগরণ ততখানি নয়। ঐতিহাসিক রসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা চলে, "রাজ্যের উত্থান পতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের (ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিদের, ঐতিহাসিক নাট্য-উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রের—লেখক।) ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্র-বীণার একটা তারে মূল রাগিণী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল

পশ্চাতের সরুমোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম বিচিত্র গম্ভীর একটা সুদূর বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।"—(ঐতিহাসিক উপন্যাস : সাহিত্য।) কুমুদরঞ্জন আদৌ এই রসের রসিক ছিলেন না। তাই ঐতিহাসিক রস বা সুদূর অতীতের রোমান্স-রহস্য-উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণাঢ্য পৌরাণিক রসের কবিতা রচনায় তাঁর আগ্রহ কম; এবং যতটুকু আগ্রহ, সাফল্য তার চেয়েও কম।

সোমনাথের মন্দির নিয়ে লেখা কবিতাবলীতে ইতিহাসরসের উদ্দামতা ও গাম্ভীর্য সঞ্চারের চেষ্টা আছে। কিন্তু ক্বচিৎ দু'একটা পংক্তির সাফল্য ব্যতীত সে-চেষ্টা অপুরস্কৃতই থেকে গিয়েছে।

পিনাকী তোমার ডমরুর সাড়া পশছে আমার কানে

কিংবা

ত্র্যম্বক্ তব অট্টহাসের ধ্বনি কানে এসে লাগে

প্রভৃতি দু-চারটি পংক্তিতে রুদ্ররূপী মহাকালকে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা রূপে অঙ্কনের প্রয়াস গম্ভীর শব্দচিত্রে ভাষাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে হয়, এ কবিতাগুলিতে চিত্রকল্পে যে অভ্রভেদী মহিমার দ্যোতনা প্রত্যাশিত তা প্রকাশিত হয় নি। এ কবিতাগুচ্ছে ভক্তির অতি তরলপ্রবাহে রুদ্র গাম্ভীর্য বিচলিত; কাব্য-অঙ্গ-সংযোজনের ক্লাসিক ঘন-পিনদ্ধতার অভাবে এদের রূপরচনা শিথিল; হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা এখানে অতিপ্রত্যক্ষ (প্রাচীন গ্রীক দেববাদে বিশ্বাসী মেগাস্থিনিস, চৈনিক বৌদ্ধ হুয়েনসাঙ এবং মুসলমান পণ্ডিত আল বেরুণীর সোমনাথ মন্দির বন্দনার মধ্য দিয়ে এই সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়।) এবং পুরাণ-ধর্মতত্ত্ব-দর্শনের প্রসঙ্গ উল্লেখে এরা তথ্য ভারাক্রান্ত। "স্থপতি" কবিতায় কোণারকের মন্দিরের জনৈক স্থপতিকে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন কবি। সেই অতি সাধারণ মানুষটির জাতিস্মরতা জেগে উঠল সূর্যমন্দির দর্শনে। কিন্তু এই ঘটনার

মধ্যে যে বিপুল নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল কুমুদরঞ্জনের কবি-মনের তা সামীপ্য পায় নি। তাই কতকগুলি নীরস তথ্যের বিবৃতিতে এর রসরূপ স্খলিত।

আসলে মহিমান্বিত বস্তুর অভ্রংলিহ রূপ তাঁর কবিচিত্তের সামগ্রী নয়। তাই তাঁর কল্পনায় "বিন্ধ্যের আনন্দ" দম্ভ-দর্প-ক্রোধে সূর্যকে অবরোধ করায় নয়, "আত্মসমর্পণেই তৃপ্তি তাঁর"—

সূর্যকে রোধ করুক যাহারা পারে
বিন্ধ্য বিলীন একটি নমস্কারে।
প্রতাপ-প্রয়াসী পাহাড় নহে সে আর
অফুরন্ত সে একটি নমস্কার।

এটি কবি কুমুদরঞ্জনের কবি-হৃদয়েরই গূঢ় বার্তা। কিন্তু এখানে অনায়াসে বিন্ধ্যের উদ্ধত মস্তককে ধূলায় লুণ্ঠিত করায় আরোপধর্ম অতি প্রকট হয়ে রসস্ফূর্তিকে ব্যাহত করেছে। একটি নাটকীয় চমকের উপস্থাপনায় এই মুহূর্তটির উত্তেজনা ধরে রাখা যেত। কিন্তু সে-রসের সৃষ্টিতে কবির গরজ নেই।

'অর্জুন'কে অবলম্বন করে কুমুদরঞ্জন যে কবিতা লিখেছেন তাতেও এই মনোবৃত্তি প্রতিফলিত। বীরর্ষভ অর্জুন কবি কুমুদরঞ্জনের শান্ত সমতল প্রাণকে আকর্ষণ করল কি করে প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু কবিতাটির উপসংহারে কবি স্বয়ং তার উত্তর দিয়েছেন। মহাপ্রস্থান কালে জনৈক চিত্রশিল্পী অর্জুনের কর্মবহুল জীবনের বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়-গুলিকে রঙে-রেখায় জীবন্ত করে এঁকে এনে উপহার দিলেন। কবির বর্ণনায় তার যে ভাষারূপ প্রকাশিত তা প্রাণহীন এবং চিত্র হিসেবে একান্ত অকিঞ্চিৎকর। যেমন—

মৎস-চক্র ভেদ করিছেন কিশোর সব্যসাচী,
বিপুল জনতা হেরে সাফল্য যাচি'।

কিংবা

বিরাট গোগৃহে যুঝিছেন দেখ বৃহন্নলার বেশে—
চেনে শত্রুরা শরের আঘাতে শেষে।

আবার

শরশয্যায় তৃষিত ভীষ্ম, গাণ্ডীবী চঞ্চল
ভোগবতী ধারা উঠে ভেদি' ধরাতল।

এই বিচ্ছিন্ন বর্ণনাগুলির মধ্য দিয়ে সব্যসাচী অর্জুনের বিরাট ব্যক্তি-গৌরব একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ নিয়ে আদৌ ফুটে ওঠে না। আসলে অর্জুনের কর্মযজ্ঞের এই বিপুল অনুষ্ঠানগুলি কুমুদরঞ্জনের কাছে কিছু গভীর তাৎপর্যবহ নয়। অর্জুনের সর্ব গৌরব যেখানে সঙ্কুচিত ভক্তির দানতায় সেখানেই তাঁর সত্য পরিচয় কুমুদরঞ্জনের কবি-কল্পনায়—

তাঁহাকে খেলার পুতুল করিয়ো, কৃষ্ণকে বাজিকর
সে ছবিই হবে সত্য ও সুন্দর।

॥ তিন ॥

কুমুদরঞ্জন একান্তভাবেই পল্লীবাংলার কবি। সহরবাস তাঁর কাছে বনবাসের সমতুল্য। সহরের যন্ত্রের ও ঐশ্বর্যের বিরাট বিপুল আয়োজনের দিকে তাঁর দৃষ্টি না থাকলেও, ক্ষুদ্র "রিক্স" গাড়িটি তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। কবি-প্রাণের যে বিশেষ আসক্তির কথা বলেছি এর পেছনে তারই প্রেরণা জীবন্ত। কবিতাটিতে কিছু কৌতুকরসের পরিবেশনও করা হয়েছে—

টুকটুকে লাল তার সুখাসন ভাই,
হিন্দোলা নয়, হয় দু'জনার ঠাঁই।

সন্‌সন্‌ ধায় ট্রাম মোটরের দল,
রিক্‌স এ টুনটুনি, তাহারা ঈগল।
ফায়ার ব্রিগেড ছোটে নাইকো গুজার,
এ যেন রে জেলে-ডিঙ্গি, তাহারা ক্রুজার।

রাজ্যের যানবাহন কবির কাছে বিরাট বিপুল মহাকাব্যের মত আয়ত্তাতীত, দূর থেকে সম্ভ্রম জাগাবার বস্তু, কিন্তু রিক্‌স যেন সুন্দর স্নিগ্ধ একটি উদ্ভট শ্লোক। ধ্রুপদ-খেয়ালের আভিজাত্য ও জটিল মহিমা তার নয়, সে "তাইরে নাইরে যেন দুইটি কথার"; হীরা জহরতের সঙ্গে তার তুলনা চলে না, সে যেন ছোট রঙীন পুঁতির চুমকি; মেঘনা-দামোদরের উদ্দাম-বিস্তৃতি তার নেই, অতি ছোট গিরি-নির্ঝরেই তার উপমা। তার ক্ষীণ দেহ "মরু হতে মেরু আর পেরু হতে চীন' যেতে পারে না বলেই কবি বলেন—

ভালবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি,
গ্রাণ্ডি ফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটি।

এই প্রীতির কারণটি খুঁজতে খুব দূরে যেতে হবে না। কবির সরল সহজিয়া মনের এই-ই একমাত্র উপযুক্ত যান।

লঘু কৌতুকের এই সুরটি যে কবির গভীর প্রীতিরসের যোগে কি করে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে তার কারণ মিলবে কবির ব্যক্তিপ্রাণের বিশিষ্ট প্রবণতার মধ্যে। কাজেই ক্ষুদ্র মৌচাক দেখে যখন কবি বলেন—

উইণ্ডসর কি পোস্টডাম ক্রেমলিন
ইহার নিকট লাগে তা নেহাৎ দীন।

তখন তাতে কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু গভীরতর ব্যক্তি-জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত মেলে।

। চার ।

এই মনোভাবে কবির অধিকাংশ রচনাই রঞ্জিত। তাঁর কবিতা যেখানেই বৃহৎ ও বিস্তৃত, সমুচ্চ ও বর্ণাঢ্য, গভীর ও বিক্ষুব্ধ রাজ্যে প্রবেশ করেছে রচনায় শিথিল অসৌকর্য সেখানেই প্রকট। কবির কাব্য-কল্পনায় যে বিষয়সমূহ গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের অভাব আছে। সামান্য কয়েকটি বিষয় মাত্র তাঁর কাব্য সাধনার অঙ্গীভূত।

এক। স্বদেশপ্রেমমূলক কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন। তাদের সংখ্যা অধিক নয়। উদ্দীপনাও চিত্তপ্লাবী নয়। কবির কাব্যপ্রবাহে এই উপধারাটি পরিমাণ ও গুণে একান্ত সংকীর্ণ।

দুই। ইতিহাস-পুরাণের রাজ্যে কবি কখনও কখনও পরিক্রমা করেছেন। সে সব কবিতায় সাফল্য আসে নি, এবং কেন আসে নি তা আমরা দেখেছি।

তিন। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি কবিচিত্তের প্রধান আকর্ষণস্থল। এ বিষয়ে কবি এত অধিকসংখ্যক কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর সাধ্যায়ত্ত সীমাবদ্ধ সার্থকতা লাভ করেছেন যে, এটিকেই তাঁর কাব্যের মূল প্রবাহ বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু লক্ষণীয় প্রকৃতি-চেতনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ-সুলভ সুদূরাভিসারের পক্ষকামী নন। চার পাশের অতি সামান্য নিসর্গ বস্তুর ক্ষুদ্র উপচারেই তিনি সন্তুষ্ট, তার রসভোগেই তিনি তৃপ্ত। এই তৃপ্তি-স্নিগ্ধতা বিষয়বস্তুর সামান্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিশেষ ধরনের আস্বাদের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথও একদা ফুলেদের রাজ্যের কুরচি-কন্টিকারীদের গান গেয়েছিলেন।

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা

যে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে লাঞ্ছনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে।

কিন্তু সামান্য তাঁর কাছে বৃহৎ ও অসীমের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। উন্মাদিনী পদ্মার তরঙ্গোচ্ছ্বাসের স্থানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ক্ষীণস্রোতা স্বল্পতোয়া কোপাইকে। মৃত্যুমুখীন্ বার্ধক্যে রোগক্লিষ্টতার মধ্যে তিনি চড়ুই পাখীকেও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করেছিলেন, কিন্তু শ্রান্ত কবির রোগজীর্ণ কল্পনার প্রতিফলন হিসেবেই তার মূল্য। সামগ্রীক ভাবে দেখলে রবীন্দ্রকাব্যে যৌবনগর্বিত উজ্জ্বল-পুচ্ছ ময়ূরের প্রবেশাধিকার ছিল আরও সাবলীল, আরও স্বীকৃত—

ময়ূর কর নি মোরে ভয়
সেই গর্ব সেই মোর জয়।

কুমুদরঞ্জন কিন্তু ভুঁইচাঁপা, জুঁই, ঝুমকা ফুল, ঝিঙে ফুল, তৃণকুসুম, পাথরের ফাটলের ছোট্ট বুনো ফুল এদের রাজ্যেই পরিভ্রমণ করেছেন। এদের সঙ্গেই তাঁর মানস-সামীপ্য। পাখীদের মহল্লায়ও তাঁর যাতায়াত আছে, তবে সেখানে টুনটুনি ফিঙেদেরই ভীড়, ক্বচিৎ ক্ষুদ্র চকোরের আনাগোনা; শুয়োঁপোকা, প্রজাপতি, মৌমাছিদের দাবীও তাঁর কাছে কিছু কম নয়। ঋতুর বিরাট চক্রাবর্তনে নটরাজ-নৃত্যের কল্পনা তাঁর কবিচিত্তের আয়ত্তগম্য তো নয়ই—এমন কি সাধারণভাবে বর্ষার প্রবল প্রাচুর্যের তুলনায় আকাশের মেঘকরা; গ্রীষ্মের রুদ্র দাবদাহ, বসন্তের প্রগলভ আনন্দ ও ঐশ্বর্যের তুলনায় শীতের শীর্ণতা, তাঁকে অধিক মুগ্ধ করেছে। "শিশিরের দেশ" বার বার তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। গ্রামের ঘোষালদীঘি আর তালপুকুরের যে আনন্দ, সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনেও তা তিনি উপভোগ করেন নি। চুর্ণীনদীর মিঠে নাম ও স্থবির গতিই তাঁকে আকর্ষণ করেছে। অজয়ের বন্যা নিয়ে লেখা কবিতাও আছে, কিন্তু তা একান্ত নিকট আত্মীয়ের ক্ষণিক ক্ষেপামি বলেই।

চার। মানুষের যৌবনের বলদৃপ্ত আত্মঘোষণায় তাঁর বিশ্বাস নেই, আসক্তি নেই তাঁর সৌন্দর্য-বিহ্বল রোমাঞ্চকর প্রণয়াবেশে। "যৌবন" কবিতাটিতে নব উদ্বোধিত সৌন্দর্য-চেতনা, দুরাভিসারের বন্ধ-মুক্ত উদ্দাম কামনা এবং প্রেমবোধের আকস্মিক আবির্ভাবের যে চিত্র অঙ্কিত তাতে প্রাণের স্পর্শ নেই, তার ভাষায় সুদূরের আহ্বানের ব্যঞ্জনা নেই, নেই উদ্দাম কল্পনার রসরূপ—

অবিরাম এ কি ফুল বৃষ্টি,
সহসা কি রসায়ন বদলালো দেহ-মন।
এত শোভা কোথা পেল দৃষ্টি।
কি অথৈ বন্যা লাবণ্যের
কোনখানে লেশ নাই দৈন্যের
একি প্রেম ভালোবাসা দূরাধিরোহিণী আশা
এ কি নবীনতা পেল সৃষ্টি।

কবিতাটির সমাপ্তিতে যৌবন-স্বর্গ ভেঙে যাওয়ার বর্ণনা,—তাতে কিন্তু নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধতা নেই, হতাশের দীর্ঘশ্বাস নেই, কবি যেন স্বভাবসঙ্গত-ভাবে তাকেই গ্রহণ করেছেন—

উৎসব সচকিত থামে রে
সহসা কোথায় যায় ভাটা পড়ে এ শোভায়,
ধীরে ধীরে কি তিমির নামে রে!
কুম্ভের মেলা হয় ভঙ্গ
চারিদিকে ভাঙ্গন-তরঙ্গ,
বালুকার বেদিকায় ফুলপাতা পড়ে হায়—
ধুনীর ভস্ম ডা'ন বামে রে।

কিশোর ও শিশুরাজ্যই তাঁর মনোরাজ্য। বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন—

নাতি সাথে একাসনে বসে দুই বালকে,
ত্রিদিবের কথা কয় প্রদীপের আলোকে।

শিশুচরিত্রে দুষ্টুমি আছে, কিন্তু স্নেহদৃষ্টিতে তাকে উপভোগ করা চলে, যৌবনের উদ্দাম আবেশের মত তা স্থিতিকে, সংযমকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে প্রবাহিত হয় না। আর বার্ধক্যে শীর্ণধারা নদীতে তরঙ্গহীন প্রশান্তি কবির কাছে স্বাদু ও সত্য হয়ে দেখা দেয়। "শিশুরাজ্য", "চঞ্চলের জয়যাত্রা", "দ্বিতীয় শৈশব", "সদানন্দ", "কৈশোরান্তে", "চৈত্রবৈশাখী", "বৃদ্ধ", "পাঠশালায়" প্রভৃতি কবিতায় এই মনোভঙ্গির প্রমাণ মিলবে। শিশুরাজ্যের এই ছবিতে—

সেখানে আকাশ রাঙ্গা রাঙ্গা রবি ওঠে নি—
কমলেরা চোখ মাজে, এখন তা ফোটে নি,
ডাক শেখে শাবকেরা বসি' নিজ কুলায়ে
বহে সমীরণ শিশু-লতিকারে দুলায়ে।

ভাষায়-ভঙ্গিতে, ভাবে এবং রূপরচনায় একটি স্নেহকোমল বাৎসল্যরসের উৎসারণ ঘটেছে। "চঞ্চলের জয়যাত্রা" কবিতায় রূপকথার তরল কল্পনার খেয়ালীপনায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধ স্পর্শটি কুমুদরঞ্জনের নিজস্ব মানসিকতার ফল। "সদানন্দ" কবিতায়ও এদের কথা। যৌবনের স্বর্ণমৃগ মরুর মরীচিকার মত পথ ভোলায়; কবি শৈশবকে উপমিত করেছেন কনক কুরঙ্গের সঙ্গে—

ভালবাসি উহাদের সঙ্গ—
নয় মায়ামৃগ ওরা—কনক কুরঙ্গ।

শব্দার্থে পার্থক্য নেই। কিন্তু ধ্বনির পার্থক্যে "কনক কুরঙ্গে"র সর্বদেহে নবজাত শিশুর যে কোমলতা দ্যোতিত "মায়ামৃগে" তা নেই। কুরঙ্গে স্পর্শ-কোমলতার ভাব আসে, স্বর্ণমৃগ কেবলই দ্রুতবেগে অপস্রিয়মান।

যৌবনের ঋতু বসন্তের আগমন আকস্মিক, তাই নাটকীয়। তার চেয়ে কবির কাছে প্রিয় কিশোর প্রাণ, কারণ—

মধুমাস নয় ওরা গোটা মধুবর্ষ।

"কৈশোরান্তে" কবিতায় যৌবনাবেগের কিছু স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু কৈশোরের অবসানে কবির বেদনাও বেশ স্পষ্ট—

শোকেতে শিশির ঝরে, ফুল পড়ে টুটিয়া
সানায়ের সুর কাঁদে সমীরণে লুটিয়া;

"দ্বিতীয় শৈশব" কবিতায় বার্ধক্যকে বাল্যের পুনরাবির্ভাব বলে গ্রহণ করে কবি দ্বিধায় পড়েছিলেন। বোধনের ঘটে বিসর্জনের চিহ্ন দেখে ব্যথাও পেয়েছিলেন। কিন্তু "বৃদ্ধ" কবিতায় কবি দ্বিধা-উত্তীর্ণ। বার্ধক্যের প্রতি একটি অকুণ্ঠ প্রীতি এ কবিতার শব্দচয়নে ও চিত্র-নির্মাণে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'চীর' গাছ আজ তুষারের চাদরে ঢাকা পড়েছে—মৃত্যুর বর্ণে আর শিশিরের আদরের টানা-পোড়েনে সে-চাদর নির্মিত। জাফ্রানের ক্ষেতে পড়েছে তুষারের ছাউনি, রজত-শুভ্র বর্ণ নিলাম করে শ্যামলের অধিকার হরণ করেছে, কিন্তু কবির বিশ্বাস অম্লান—

তার আশা ভালোবাসা ঢাকা আজ তুষারে।
কোন দেশে পোহাইবে তার নব উষা রে।
পথ তার ফুরাবে গো ব্যথা তার ভোলাবে।
রাঙ্গা ভাঙ্গা ক্ষেত তার ভ'রে যাবে গোলাবে।

অধ্যাত্মচেতনার স্পর্শ আছে এই চরণগুলিতে, কিন্তু গভীর ভালবাসার সুরই এর প্রধানতম সম্পদ।

একদিকে বার্ধক্য, অন্যদিকে বাল্য-কৈশোর। এদের মিলনের একটি অপূর্ব ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন কবি "চৈত্র বৈশাখী"তে। ঠাকুরদাদার কোলের নাতিটীকে কবির মনে হয়েছে পক্কফলের কাছে নতুন কুঁড়িটির

মত ; মাথুর আর পূর্বরাগের মেশামেশি, বোধন আর বিসর্জনের নিভৃত আলাপ—

লক্ষ্মীজোলে পাকার পাশে নূতন রোয়া ভুঁই,
বন-ধুতুরার পাতার ফাঁকে আধফোটা এক জুঁই।

আর সমাপ্তিতে পুরাণ-কথার উল্লেখে অতি ঘনিষ্ঠ পরিবার-বন্ধনের রসাস্বাদের সার্থকতা—

হংস উঠে শিউরে, শিখী পুচ্ছ তুলে নাচে,
কার্তিকেয় দাঁড়ায় যেন চতুর্মুখের কাছে।

পাঁচ। প্রেমের কবিতা তিনি লিখেছেন সামান্যই। তার সুর মৃদু, পরিবেশ ঘরোয়া। যৌবনের রক্তচাঞ্চল্য নেই, হৃদপিণ্ডের উদ্দামতা নেই। দাম্পত্য-সম্পর্কের গৃহবাসী পারাবত-প্রেমেই তাঁর তৃপ্তি, মুক্ত-প্রেমের লীলা-বিলাসে তিনি উদ্দীপিত হন নি, পরিবার বন্ধনকে ছিন্ন করার কথা কল্পনাও করেন নি। এই পরিবারজীবনের একটা বিশেষ রসাবেদন তাঁর কবিতায় আস্বাদ্য। পুরানো চিঠির ফাইল, কিছু তৈজস, একটি ছিন্নপ্রায় বিবাহের ফর্দ, একজোড়া প্রাচীন গয়নার মত সামান্য বস্তুকে অবলম্বন করে এক ধরনের সরস কবিতা তিনি লিখেছেন। প্রেম ও পরিবার-রসের কবিতায় এই বিশিষ্টতার মধ্যে কবিপ্রাণের মূল যে প্রবণতার কথা বলেছি তারই সাক্ষ্য মেলে।

বিষয়বস্তুর সামান্যতার সঙ্গে এসেছে রূপাকৃতির ক্ষুদ্রতা। কুমুদরঞ্জনের অনেক কবিতা আকারে সনেটের মত ক্ষুদ্র, অথচ সনেটের দৃঢ় বন্ধনের আস্বাদ তাদের নেই। কতকগুলি কবিতা সনেটের চেয়েও ক্ষুদ্র, প্রায় চুটকি জাতীয়, অথচ শ্লোকের তীক্ষ্ণতা সেখানে অনুপস্থিত। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার কবিতাগুলিও ৩০।৪০ পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কবির চিত্ররচনায়ও তুচ্ছ বস্তুর সঞ্চয়-প্রবণতা স্পষ্ট। আকার ও রূপদেহ রচনার এই বিশিষ্টতা কবির প্রাণকেন্দ্র থেকেই উৎসারিত।

॥ পাঁচ ॥

তৃণকুসুমের ঘ্রাণ ও শিশিরকণার রূপে মুগ্ধ কবির চিত্তকেন্দ্রের যে পরিচয় দেওয়া হল তার দায়িত্ব প্রধানত কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের এবং গৌণত তাঁর বৈষ্ণবভাবুকতার। কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা উত্তেজনাহীন প্রশান্তির সুর আছে। বর্ণসম্পাতের মৃদুতা, সুরঝংকারের কোমল সরলতা, বিষয়বস্তুর সামান্যতা ও ক্ষণিকতা এবং হৃদয়ানুভূতির সংযত সমতালে কবিমনের এই প্রশান্তি চিহ্নিত এবং সম্ভবত কবির বার্ধক্য চেতনার সংগে এর সম্পর্ক আছে।

কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণব-ভাবুকতার বিস্তৃত পরিচয় অন্যত্র আলোচ্য। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে বৈষ্ণব-দীনতা তাঁর অন্তরের সহজাত মনোভঙ্গিতে পরিণত হয়েছিল। দাস্যভক্তের হৃদয়ানুভূতির সংযত, নম্র নীরবতায়ই তাঁর বৈষ্ণবচিত্তের প্রকৃত পরিচয়। কান্তারসের উচ্ছ্বাস-প্রবলতার তিনি শরিক নন। ভগবানের ঐশ্বর্যের বোধ মন থেকে একেবারে দূরে সরাতে চান না বলেই সখ্য বা বাৎসল্যানুভূতির সাহস তাঁর নেই।

কবির জীবন-দৃষ্টির কেন্দ্রে বৃদ্ধের সংযত শান্ত রস আছে, পরিণত গভীরতা নেই। সামান্যকে দেখে খুশি হবার মত মনের সরলতা এবং সরসতা আছে, কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসার জটিলতা নেই। কুমুদরঞ্জন যন্ত্রণাযুগের মানুষের চিন্তাতপ্ত ললাটে শান্তিজল বর্ষণ করেন, কিন্তু ঘাসের শিষের শিশিরকণার মত তার সংক্ষিপ্ত স্থিতি মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। ঐ মুহূর্তশীতলতার মোহাবেশই তাঁর দান।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

অজয়ের চর ও গ্রামের মায়া

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটা কাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল স্বর্গের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্তহাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দরিদ্রের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী

এক ॥

কুমুদরঞ্জন প্রকৃতির কবি হিসেবে পরিচিত ; বিশেষ করে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়রূপে অবলম্বিত। রবীন্দ্র-অনুজ কবিগোষ্ঠী পল্লীবাংলার প্রতি আপনাদের প্রীতিকে কবিতার ভাষায় অজস্র ধারায় ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-দৃষ্টির কিছু ছায়াপাত এর উপরে আছে বলে আগেই মন্তব্য করেছি। তবে একথা মেনে নিতে হয় যে রবান্দ্রনাথের নিসর্গবোধের গভীর দার্শনিকতা ও অত্যুচ্চ ভাব-কল্পনার রাজ্যে এঁরা কদাপি পৌঁছুতে পারেন নি এবং পৌঁছুবার চেষ্টাও করেন নি। কুমুদরঞ্জন সে বিষয়ে

সম্ভবত অচেতনভাবেই অতিসচেতন। কাউকে অনুসরণ বা অনুকরণ করার শিল্পবুদ্ধি তাঁর মনে জাগতেই পারে না। রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁর উপরে যা পড়েছে তা সূর্যালোকের মত স্বাভাবিক ধারায়, সচেতন অনুকরণের পথ বেয়ে নয়। "চকোর" প্রভৃতি দু'চারটি মাত্র কবিতায় রবীন্দ্র-কল্পনানুযায়ী সুদূরে অভিসারের যে সুর প্রত্যাশিত ছিল তাও শেষ পর্যন্ত দীনভক্তির নম্র নমস্কারে এবং আপন সংকীর্ণ প্রাপ্তির তৃপ্তিতে নিশ্চিন্ত। চকোরের স্ফটিক জল ও চন্দ্রকিরণের কামনা বস্তুপৃথিবীর উর্ধ্বলোকের রোমান্টিক আকুতি প্রকাশ করে এবং এক অনির্দেশ্য বেদনার ব্যঞ্জনা আনে। কুমুদরঞ্জনের "চকোরে" তাই দ্বিধা আছে, কামনার মুক্তপক্ষ বিহার নেই। সে একবার বলে—

দীন অধিবাসী আমি বটে ধরণীর,
আকাঙ্ক্ষা মোর আকাশে বেঁধেছে নীড়।
গরুড়ের সাথে মোর জ্ঞাতিত্ব স্মরি আমি অহরহ,
স্বর্গ মর্ত্যে বিচ্ছেদ দুঃসহ।
ভুলে যাই মোর গৃহ,
গগনের চাঁদ হইয়াছে আত্মীয়।

কিন্তু পরক্ষণেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পৌঁছায় যে ঐ চাঁদ "অরূপ" নয় "কখনো 'কৃষ্ণ' স্বর্ণবর্ণ কভু"। তার পাখা নীল আকাশের অসীমে মেলে দেবার জন্য নয়, "তাঁরি কাছে যাবার লাগি এ পাখা" আর "কণ্ঠের কাজ কেবল তাঁহাকে ডাকা।" ধর্মবোধের এই অনির্বাণ বিশ্বাসে রোমান্টিক অতৃপ্তির ছায়াপাত সম্ভব নয়। তাই উর্ধ্ব আকাশকে পাওয়ার বাসনা মুহূর্তের জন্য দেখা দিলেও আসলে কুমুদরঞ্জনের চকোরের এইটিই মনের গূঢ় বাণী—মাটির এই নৈকট্য, তুষ্টির এই প্রশান্তি—

শুনি কোকিলের কুহু ও শ্যামার শিস
কি মধু কণ্ঠ দিয়াছেন জগদীশ।

শিখী-শিখিনির নৃত্য।
আনন্দে মোর শিহরিয়া ওঠে চিত্ত।
ঐ গৌরব উহাদের থাক হেরি হয়ে প্রীতিকামী
আমি যা পেয়েছি তাতেই তুষ্ট আমি।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের কবি-দৃষ্টির তুলনা চলে সঙ্গত কারণেই, কারণ প্রতিভার উৎকর্ষের কোনরূপ তুলনা না চললেও বলতে হয় যে উভয়েই প্রকৃতি-প্রাণ কবি; রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দৃষ্টি বিশ্ব নিখিলের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে মুক্তির দ্যোতনা আনে। সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান পায়। আপন রোমান্টিক চেতনার রঙে তাঁর প্রকৃতি নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী করে পাঠককে। "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।" ঋতুতে ঋতুতে চলে তাঁর নটরাজের উৎসবসজ্জা। "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"—(রবীন্দ্রনাথ : ঋতুরঙ্গশালার ভূমিকা)। আর আপনার সঙ্গে নিখিলের জড় পরমাণু থেকে শুরু করে বৃক্ষ-পক্ষী-নদ-নদী উপত্যকার কি নিবিড় সংযোগের উপলব্ধি, "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়্‌ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকৃত—আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দময়, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন

এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকৃত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছে শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে!" —(ছিন্নপত্র)। মানুষ তাঁর কাছে পরম সত্য, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত হয়েই। মানুষের ম্লান জীবনের জীর্ণ প্রত্যহের উপরে প্রকৃতির সৌন্দর্য-সম্পাতই অন্তর্লীন সত্যকে উদ্বুদ্ধ করে তার সত্যকার মনুষ্যত্বকে মুক্তি দেয়।

এই দার্শনিক জিজ্ঞাসা—উপলব্ধির এই প্রসার ও গভীরতা কুমুদ-রঞ্জনে কেন, বিশ্বের কজন কবিতে মিলবে তা গবেষণার বিষয়। তবুও কুমুদরঞ্জন নিজস্ব বোধে স্থিত। সে বোধে দর্শন নেই, গভীরতা-বিস্তৃতি-জটিলতা নেই, কিন্তু আন্তরিকতা আছে, আর আছে সরল কিন্তু উপভোগ্য সরসতা।

কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতির গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ। বলা যেতে পারে সঙ্কীর্ণ। গ্রাম, তার পথ-ঘাট, ধানের ক্ষেত, ঘোষালপুকুর, প্রাচীন অশথ আর বকুল গাছটির সীমানা ছাড়িয়ে সে উধাও মাঠের দিগন্ত অভিমুখে যাত্রা করে না। অজয়ের নদীস্রোত, তার শীতের শীর্ণতা, বর্ষার বন্যা, আর বুকের ওপরে জেগে ওঠা চর তাঁকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তার গ্রাম-উপলব্ধির অন্তরে অন্তরে এক বিচিত্র গতির বেদনা সঞ্চারিত করে না। অপরিচিত ফুল-পাখি-পতঙ্গ আর লতা-পাতা-গাছ-গাছালি, আজন্ম পরিচিত গ্রামটিই তাঁর কল্পরাজ্য। সুদূর তাঁকে টানে না, বিচিত্রের আহ্বান তাঁকে উদ্দাম করে তোলে না। "জালন্ধরের পথে"ও

যে কবি বঙ্গ-বধূর মধুর শোভা আর অমৃতে ভরা চাউনি সন্ধান করে বেড়ান বৃথাই তাঁর বিদেশ-ভ্রমণ। "বিদেশে" বসেও কবির মন একটি মাত্র গানের কলিকে ভর করে গ্রামের পথ-ঘাট সবুজ ধানের শিষের অতি-পরিচিত ফেলে-আসা রাজ্যে ফিরে চলে। "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড"এর দীর্ঘ পথরেখাও তাঁর মনের কোন গভীর তারকে বাজাতে পারে না, কিছু স্মিত হাস্য, কিছু ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্যেই তিনি বিচিত্র প্রকৃতির সুদূরের আহ্বানের উত্তর দেন, এবং কবিতার সমাপ্তিতে মনের এই কথাটিকে সামলাতে পারেন না—

বাঙালীর ছেলে বাঙলার লাগি' তবু আঁখি মন ঝুরছে।

আর কুমুদরঞ্জনের এই বাংলা বিশেষ করে পল্লীবাংলা।

কালিদাস রায়ের মত পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গীত যাঁদের কবিতার অন্যতম প্রধান সুর তাঁদের সঙ্গেও কুমুদরঞ্জনের মনোভঙ্গির পার্থক্যটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কালিদাস রায় দেহে-মনে গ্রাম থেকে দূরে, সহরের অধিবাসী। তাই গ্রামপল্লীর বুকে মনের পথ বেয়ে বার বার ফিরে আসায় পুরানোকে নতুন করে পাওয়ার এক রস-রহস্য-স্মৃতি-বেদনার সুর বেজেছে—

ভাঙ্গাবাঁশী জোড়া দিয়ে বীণা ফেলে তাই নিয়ে ফিরিয়া এলাম।
বহু অপরাধ জমা, স্নেহভরে কর ক্ষমা, লও মা প্রণাম।
চিনিবে কি ছেলেটিরে ? সব ভোল গেছে ফিরে, দ্বিধা জাগে তাই ;
মা কি কভু ছেলে ভোলে যতদূর যাক চলে ?—বৃথাই শুধাই
এ দগ্ধ ললাট তট স্নিগ্ধ করি দিক বটচ্ছায়ার প্রসাদ,
পাখীর ডানার ঘায়ে বকুল ঝরায়ে গায়ে কর আশীর্ব্বাদ।

—(প্রত্যাবর্তন।)

কিন্তু কুমুদরঞ্জনেরমনেকোনকৈফিয়ৎ জমানেই। কারণ দেহে-মনে-প্রাণে

আত্মার গূঢ়তম সংস্কারে তিনি পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে একাকার। ঘোষাল দীঘির পদ্মটির মত, অশথের পল্লবের মত, অজয়ের চরের কাঁশের গুচ্ছ কিংবা ভুইচাঁপার মত তিনি এই গ্রাম্যপ্রকৃতির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ যেন। কয়েকদিন সহরবাস তাঁর কাছে মনে হয় মাটির সহজ স্পর্শ থেকে ছিন্ন হয়ে ফুলদানির সাজান ফুলের নিশ্চিত মৃত্যুবরণের প্রতীক্ষার মত—

বনবাস মোর শেষ হবে কবে ? জান যদি কেহ, কহ রে।
চৌদ্দবরষ রহেছি যে আমি মোর গ্রাম ছাড়ি' শহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল, ছিল ফুলতরুলতিকা
স্বচ্ছসলিলা ছিল গোদাবরী সকল বেদনাহারিকা।
এখানে তো নাই বনমর্ম্মর বনবিহগের সাড়াটি,
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি ক্ষীণবল জলধারাটি।
কোথা আমগাছ ঝুপ ঝাল্লর কোথা বটগাছে ঝুলব ?
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকুল যেথা বুনো ফুল তুলব।

সহরবাসই তাঁর কাছে 'বনবাস', এবং এই বনবাসে তাঁকে দীর্ঘকাল কাটাতে হয়নি। তাই বিরহী পল্লীপ্রেমিকের প্রত্যাবর্তনের সুর নেই তাঁর প্রকৃতি-কবিতায়, সহরবাসীর পল্লীর প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণও নেই। তিনি পল্লীর বুকের মধ্যে লতায়-পাতায় জলে-পথে পতঙ্গের পাখায় আর ধানের শিষে জড়িয়ে আছেন—

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ আমি তার শশী-রবি,
আমি আলোছায়া গীত ও গন্ধ মাঠ দিগন্ত শোভি।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল,
আমিই কুমুদ, আমিই কমল।
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ, আমি তার দীন কবি।

আর জড়িয়ে জড়িয়েই কবি তাঁকে ভালবাসছেন, অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন না, তৃপ্তিতে তাঁর সর্ব-অঙ্গে ঘুমের সুখাবেশ ঘিরে ধরেছে।

করুণানিধানের প্রকৃতিদৃষ্টিতেও গ্রামবাংলার সুর ও ছবি ধরা পড়েছে; কিন্তু "দিগন্ত মেঘে"র বুক থেকে তিনি কিছুটা যৌবনস্বপ্নকে পান করে আপন প্রাণ পূর্ণ করেছেন।—

শূন্য নয়ন পূর্ণ ভরিয়া
আমি সে মদিরা লইনু হরিয়া—
পাগল পরাণ পাগল করিয়া ডুবিল সন্ধ্যারবি।

অথবা গ্রামের "পদ্মপুকুরে"র তীরে দাঁড়িয়ে কি এক অতৃপ্তি অনুভব করেছেন,—

ফুরালো জলঝরা, বকুল ফুল ভরা
গ্রামের চেনা পথে ফিরে রাখাল।
উপর পানে চাহি—দোলে অধীর
তালের বাকলেতে বাবুই নীড়;
বলাকা উড়ে যায় কে জানে কে কোথায়!—
হয় তো নয় তারা এ পৃথিবীর।

বলাকার ডানার শব্দ করুণানিধানকে দিগন্তের সন্ধানে রূপাতীতের রাজ্যে নিয়ে যায় না ঠিক, কিন্তু গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে কবিকে পুরীতে-ত্রিকূটে, কাঞ্চনজঙ্ঘা-ওয়ালটেয়ার-পঞ্চকোটে, পদ্মাতটে কিংবা চিত্রাকূটে নিয়ে যায়। এর পেছনে কবির ধর্মপ্রবুদ্ধ চিত্তের সহস্র প্রবণতা থাকলেও, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্যের প্রতিও কিছু আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়।

নজরুলের কতকগুলি নিসর্গ-কবিতায় বাংলাদেশের গ্রামের সরস চিত্র এবং একটি কোমলতার সুর মেলে। কিন্তু এ কোমলতা সামান্যে তৃপ্তিজনিত নয়, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে বিক্ষত সৈনিকের ক্লান্তির ব্যঞ্জনায় ভরা।—

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
„ আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে।…
আজ কাশবনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হলুদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে।
ঐ বাবলা ফুলে নাকছাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।

বাংলা প্রকৃতির শ্যামল ছায়ায় মুহূর্তমাত্র ক্লান্তি অপনোদনের পরেই আহ্বান আসে—ডাকে পথ হাঁকে যাত্রীরা, কর বিদায়ের আয়োজন।" কাজেই কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে এর মিল নয়, অমিলই বেশী।

॥ দুই ॥

বিহারীলালের প্রকৃতিবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবিতায় অসন্তোষ-গানের বাহুল্য দেখা যায় বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু দোষ কাহাকে দিব। অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হউক তাহাতে কার্য এবং কাব্য উভয়েরই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অ যেমন বর্ণমালার আরম্ভ এবং সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত, অসন্তোষ ও অতৃপ্তি সেইরূপ সৃজনের আরম্ভে বর্তমান এবং সমস্ত মানবপ্রকৃতির সহিত নিয়ত সংযুক্ত। এইজন্য তাহা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কবিদিগের মানসিক ক্ষিপ্ততা বা পরিপাক শক্তির বিকার-বশত নহে। কৃষক-কবি যখন কবিতা রচনা করে তখন সে মাঠের শোভা, কুটিরের সুখ বর্ণনা করে না—নগরের

বিস্ময়জনক বৈচিত্র্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করে, তখন সে গাহিয়া ওঠে—

কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি।
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি, সজনি।

কলের বাঁশি যাহারা শুনিতেছে মাঠের 'বাঁশের বাঁশরি' শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশরি বাজাইয়া থাকে, কলের বাঁশি শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে।"—(আধুনিক সাহিত্য)। কিন্তু বাস্তবত গ্রামবাসী হয়েও কুমুদরঞ্জনের চিত্ত "নগরের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যে" আকৃষ্ট হয় নি। পল্লীবাসী হয়েই কবি পল্লী-শোভায় মুগ্ধ। অসন্তোষ-অতৃপ্তির চাঞ্চল্য নয়, সন্তোষ ও পরিতৃপ্তির প্রশান্ত হাস্যই তাঁর নিসর্গ কবিতার প্রধান আস্বাদ। দুই একটি কবিতায় অবশ্য একালের সভ্যতার যে কোলাহলমুখর "পথ" শ্যামল ছায়াঘেরা গ্রাম্যবনবীথি থেকে দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে সম্পর্কে কবির অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে—

আজি হায় ফুরায়েছে সে-পথের কাজ,
পিচঢালা পথে ডাকে সভ্যসমাজ।
আনমনা হরিণে যে
বনভূমি ভুলায়েছে,
বংশীর ছায়া তবু জাগে মনোমাঝ।

তবে সাধারণভাবে গ্রামবাসের এক পবিত্র শান্ত সন্তোষই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বালিকাবধূ পল্লীপ্রকৃতির মুক্ত আকাশের আহ্বান শুনেছিল সহরের ইট-পাথর ঘেরা নির্বাসনের মধ্য থেকে। স্বভাবতই বন্দী চিত্তের মুক্তি কামনা "বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্"-এর মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছিল। কুমুদরঞ্জনের "গ্রামে" কবিতায় বালিকাবধূ সহর ছেড়ে গ্রামে এসেছে। কিন্তু ছেড়ে আসা সহরের জন্ম তার হৃদয়

ব্যাকুল হয় নি। বনে নীড় বেঁধেছে যে কপোতী, প্রাসাদ-শিখরের খোঁপটি যার স্মৃতিলোক থেকেও স্খলিত সেই কপোতীর সঙ্গেই এই বালিকা আপনাকে উপমিত করেছে। প্রথম বিচ্ছেদে যে বেদনা বেজেছিল প্রাণে—

কোথায় গেল লোকের সারি, গাড়ী-ঘোড়ার গোল ?
নিত্য উজান জীবন নদী, সদাই উতরোল !
হেথায় নিতি বেণুর বনে হাওয়ার হুড়াহুড়ি,
যায় না ডেকে খেল্‌না কাচের, বেলোয়ারী চুড়ি।

কিন্তু ক্রমে এই গ্রামের প্রকৃতি আর জীবন তাকে গ্রাস করেছে, সরল কোমল সৌন্দর্য এবং সহজ প্রীতির রাজ্যে তাকে মুক্তি দিয়েছে—

পর্ণকুটীর ভুলিয়ে দেছে ভোগবিলাসের গেহ,
বুঝেছি হায় পশুপাখীর তরুলতার স্নেহ।
অর্দ্ধ অশন ছিন্ন বসন, কোলে পিঠে ছেলে,
চাইনে যেতে কোথাও আমার পাগলা ভোলা ফেলে।

দেখতে দেখতে এই সহরাগতা গ্রাম্য বধূটি বাংলার নিখিল নারী প্রাণের প্রতীক ভগবতী দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। গ্রামবাসী দরিদ্র গৃহস্থ পাগলা ভোলা মহেশ্বর হয়ে উঠেছেন এবং "কোলটি ভরে থাকুক আমার সোনার গজানন" বাঙালী গ্রাম-মাতার এই সগর্ব উক্তিতে জগন্মাতার সুর লেগেছে।

(পল্লী বাংলার প্রতি কবির এই ভালবাসা যে অতৃপ্তিজনিত নয়, সহরের গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তির কামনা নয়, কাব্যিক ফ্যাসান নয় একথা কুমুদরঞ্জন নিজেই বলেছেন—

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে,
নহেকো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুখ ভাগী,

নয় তো নেহাৎ অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি—এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে।

—(পল্লী)

বিহারীলাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন,—"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহার-প্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপনাকে বিচিত্র বিপুল ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত-সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায় আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইতে থাকে।"—(আধুনিক সাহিত্য)। তার সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতিবোধ-পল্লীপ্রীতির কোন সামীপ্য নেই। তিনি "শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত" থেকেই আনন্দিত। তাঁর পল্লীপ্রাণ কবিতা খাঁচার পাখির গানে পরিপূর্ণ, কিন্তু সে গানে বন্ধনের বেদনা নয়, আনন্দই অভিব্যক্ত। মধুকরের ক্ষুদ্র মৌচাকের মত এই গ্রামটি ঘিরেই তাঁর স্নেহের নীড়—

আমি নর্ম্মদা মর্ম্মরতটে বাঁধিতে চাহিনা ঘর,
উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দ হেরি' ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জে—মাধবীর শাখে,
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
নয় কাশ্মীর—কমল কানন তার চেয়ে মনোহর।

কবির এই গ্রামটি একটি অস্পষ্ট আদর্শ নয়; তাই অতৃপ্তির বর্ণরঞ্জিত একটি প্রত্যয় মাত্র নয় বিহারীলালের মত—

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকাল লুকাই···
চাষাদের সঙ্গেতে বেড়াই।

এই গ্রামটির একটি নাম আছে, বাস্তব অস্তিত্ব আছে, এরই আদরে কবির পিতা পিতামহ মানুষ হয়েছেন, কবির বাল্যের ক্রীড়া, যৌবনের আনন্দ; জীবনব্যাপী কর্তব্য এবং বার্ধক্যের বিশ্রাম চলেছে। কবি একটি কাব্যের নাম দিয়েছেন 'উজানি'। এই উজানি-কোগ্রাম বাংলার পল্লী-প্রকৃতির প্রতীক হতে পারে, কিন্তু কুমুদরঞ্জন বিশেষ করে এই গ্রামটির ভক্ত সেবক। অজয় নদীর তীরে এর অবস্থান, এর অবস্থান কবির সমগ্র প্রকৃতি-চেতনা জুড়ে—বলা যেতে পারে তাঁর সমগ্র কাব্য-চেতনার কেন্দ্রে। কবি তাঁর এই "দীন পল্লীর মেঠো গান" রাজসভার আনন্দোৎসবে শোনাবার স্পর্ধা করেন না। যেখানে সেতার-বাঁশরী-বীণার লহরী উদ্বেল হয়ে উঠছে সেখানে যে "মাঠের জলের জলতরঙ্গ" কারো প্রাণে দোলা দেবে না এ বোধ তাঁর আছে। কবি তাই চেনা মাঠে উদাস বাতাসে গান গাইবেন, নদীর কলকল সংগীতে মিশিয়ে দেবেন আপনার গানের সুর। উঠানে সূর্যমুখী ফুটবে, ঘাসের উপর শেফালীরা হেসে লুটিয়ে পড়বে। চেনা মাঠে উদাস বাতাসে "পল্লী-রাণীর শ্যামল মাধবী বিতানে"র কবি হয়েই তিনি থাকবেন।

॥ তিন ॥

অজয় নদ সম্পর্কে কবির অনেকগুলি কবিতা আছে। কবি তাঁর একটি কাব্যের নাম দিয়েছিলেন "অজয়"। আপন গ্রাম উজানিকোগ্রাম

ছাড়া যেমন বাংলার পল্লীপ্রকৃতি তাঁর কাছে অস্পষ্ট অর্থহীন তেমনি অজয় নদ ছাড়া উজানি-কোগ্রামের অর্থ হয় না কবির কাছে। প্রবহমান অজয় নদকে বলা যেত সেই স্রোত যার সংস্পর্শে উজানির অচঞ্চল প্রকৃতি ও জীবন গতিময় হয়ে ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পদ্মার মত অজয় গতির কোন বিশেষ সত্য হিসেবে কবির চোখে রূপময় হয়ে ওঠে নি। আর উজানির অচঞ্চল জীবন ও প্রকৃতিও তাঁর কাছে কিছু কম আস্বাদ্য নয়, অতৃপ্তিকর নয়। অজয়কে কবি ভালবেসেছেন বর্ষার বন্যায়, শীতের শীর্ণতায়, চরে আবদ্ধ স্রোতহীনতায়, আর তার অতীত ঐতিহ্যে। অজয়ের বুকে জেগে ওঠা চরটি হয়ত একান্তই সাধারণ, কিন্তু কবির মুগ্ধতায় তাতে বাধা নেই।—

আমি ব'সে দেখি অজয়নদীর চর,
নব নব রূপ ধরে সে নিরন্তর।
দূরে বহে স্রোত রজত রেখার মতো
শত জলচর কলরব করে কত।
কাশবনে তার যত শালিখের ঘর॥

(অজয়ের চর)।

প্রশ্ন জাগতে পারে, এ জাতীয় চিত্র রচনার সৌন্দর্য কোথায়? রূপরেখায়, বর্ণসম্পাতে,কোন বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, ভাবোপলব্ধির কোন অভিনব ইঙ্গিতে তো নয়। এ চিত্রটিতে এবং এমনি আরও অজস্র চিত্রে আর কিছু নেই, আছে শুধু একটি প্রশান্ত ভালবাসার স্পর্শ। সেই স্পর্শে এদের তুচ্ছতা ঘুচে গেছে। কাজেই কবি যখন অজয়ের চরকে ঐশ্বর্যের ও গৌরবের উপমায় বাঁধতে যান, তখন তাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, সহজ বলে মনে হয় না।

সোনালী উষায় আগে তারে দিনমনি
করে 'কোলারের' যেন স্বর্ণের খনি।

ক্ষণেক পরেই শুভ্র-রবির তেজে—
'গোলকুণ্ডার' হীরক-আকর সে যে,
জগৎশেঠের নিজামতী বন্দর ॥ —(অজয়ের চর)

অজয়ের চরে সকাল-দুপুরেরোদে রোদে যে বর্ণালী-বিচ্ছুরণ তাররূপ-সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ বলেই অজয় তাঁর কাছে প্রিয় নয়। অজয় তাঁর কাছে প্রিয় বলেই—সে কথাটা মাঝে মাঝে জোর গলায় চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করে বলেই—তাকে বর্ণনায় মহিমাদানের চেষ্টা। কিন্তু কোলার-গোলকুণ্ডার উল্লেখ এর স্বর্ণদ্যুতিকে বাড়াতে সাহায্য করে নি, এদের উল্লেখ ছাড়াও কবির প্রীতির স্নিগ্ধ স্পর্শ অজয় নদ আর তার চরের আলো-ছায়ার খেলাকে কিছু উপভোগ্য করে তুলেছে।

"বন্যা" নামে একটি কবিতায় কবি একদা বলেছিলেন যে, তিনি বন্যার উদ্দাম চঞ্চল গতিকে বড় ভালবাসেন। কিন্তু এই বন্যা যে ভাবের ও প্রেমের বন্যা সে কথা তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। কবির কেন্দ্রীয় জীবন-সত্য ব্যাখ্যানে আমারও ধারণা হয়েছে বন্যার উন্মাদনা কুমুদরঞ্জনের কবিচিত্তের ভাল লাগবার কথা নয়। কিন্তু অজয় নদের বন্যা একটু পৃথক ব্যাপার। অজয় যেন কবির ঘরের দুরন্ত ছেলে, প্রাণের প্রাঙ্গণে তার নিত্য মাতামাতি। বর্ষায় যখন দুকূল ছাপিয়ে জলরাশি দিকে দিকে প্লাবন আনে, কবি তার মধ্যে প্রিয়জনের ভালবাসার মান-অভিমানের এক উচ্ছ্বাস-প্রবণ পালা আবিষ্কার করেন। দুর্দম, দুরন্ত, প্রাণপূর্ণ ও বলিষ্ঠ এই বালকের "যত ভালবাসা তত বেশি তার রাগ।" বৎসর বৎসর ধরে অজয়ের তীরে আপন ভিটাটিকে ঘিরে কবি যেমন পাঁচিল তোলেন, নদীর সঙ্গে যেমন তাঁর চোখ দেখাদেখি বন্ধ হয়, আবদারি ছেলের মত সে রেগে উঠে প্রলয় ঘটায়। "অজয়ের বন্যা" কবিতাটিতে পাগলা নদীর সঙ্গে কবির ভালবাসার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছে।—

তার গৈরিক রাঙায় আমার বাস,
মোরে দেখে জল উচ্ছল হয় তার,
বুকে পাই তার নির্মল নিশ্বাস,
আমারে না দেখে থাকিতে পারে না আর!

সম্ভবত এই প্রেম কবিদৃষ্টির একটি বড় বাধা ঘুচিয়েছে, অন্তত এই কবিতায়। বন্যা-উদ্ধত অজয়ের যৌবন-সুন্দর মূর্তি তিনি আপন চিত্ত-প্রবণতার সমস্ত ধারণাকে অতিক্রম করে অন্তত একবারের জন্য উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছেন,

দেখি মহারোহ, দেখি বিজয়োৎসব,
অশ্বমেধের যজ্ঞের কোলাহল।
তোরা খুঁজে মর ভুলি আনন্দ সব,
হারালো কাহার পুঁটুলির সম্বল।

অবশ্য এ কবিতার দেহগঠনে কিছু দ্বিধা আছে। প্রথম তিন স্তবকের ভাববৃত্ত শেষের দুই স্তবকে অনুসৃত হয় নি। অজয় নদ আর কবির ভালবাসার সঙ্গে জড়িয়ে প্রথম দিকে বন্যার কিছু তরঙ্গোৎক্ষেপ আমাদের স্পর্শ করেছে, কিন্তু শেষ দিকে কবির সঙ্গে নদীর ভালবাসার কথা বন্যা-উন্মত্ত সম্রাটবেশী অজয়ের চিত্ররূপের অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে। এর ফলে এ কবিতায় ভাবরসের ঐক্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়।

অজয়ের বন্যায় ধ্বংসরূপ কবি দেখেন না। গ্রামের অতিপ্রিয় "বকুলতরু" যখন নদীর প্লাবনে ভেঙে পড়ে কবি দুঃখিত অন্তরে তাকে শেষ বিদায় জানান, কিন্তু অজয়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেন না। "প্রাচীন অশথ" যখন অজয়ের ভাঙনে পড়ে যায়, তখনও তাঁর এই প্রিয় নদীকে তিনি তিরস্কার করেন না। এমন কি নিজের বাড়িটি যখন অজয় গ্রাস করে তখনও কবি তাকে ভালবাসার আলিঙ্গন বলেই গ্রহণ করেন। কুমুদরঞ্জনের কাছে এই পর্যায়ে কাব্যসৃষ্টি ও জীবনচর্যা যেন

অপৃথক হয়ে গিয়েছে। অর্ধেক ভিটে যখন বন্যায় পড়ে যায় কবি তা ত্যাগ করতে পারেন না। এক আশ্চর্য মোহময় ভিটের মায়া এবং অজয়ের প্রতি প্রেম যেন কবিকে বাস্তব কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়ে দেয়। দুয়ারে দাঁড়ানো শিউলির গাছ দুটো তলায় অজস্র ফুল ছড়িয়ে কবিকে পিছু টানে, হাস্নুহানার সারি কবিকে ছেড়ে যেতে মানা করে, আম-তাল-বেল গাছের দল আশ্বাস দেয়। অতি পরিচিত বেণুবনের কম্পনে, কোকিল-পাপিয়ার কূজনে, ঘুরে ঘুরে বুলবুলি-শালিকের ঝাঁক বেঁধে ঘোরাফেরায় কবি এক সুস্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হতে শোনেন। আর এই পরিবেশে আপন অর্ধমগ্ন ভিটের বুকে দাঁড়িয়ে কবির মনে হয়—

মোর প্রিয় বাড়ী বটে ভাঙ্গিছে অজয়।
সে দরদী শিল্পী যে দেয় পরিচয়।
শোভে বাড়ী, আহা এ কি ভাঙনের ছাঁদ!
মহাকাল ভালে এ যে তৃতীয়ার চাঁদ।
মনে ভাবি ভাসাইল কে কৃপা করি
মন্দাকিনীতে মোর কাঠের তরী। (পুরানো বাড়ী)।

কবি সহজেই মিটিয়ে নেন তাঁর প্রিয় ভিটে আর প্রিয় নদীর এই সর্বনাশা দ্বন্দ্বকে, দীর্ঘস্থায়ী দ্বিধাদীর্ণতা তাঁর চিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না।

অজয়ের এই সর্বনাশা রূপের প্রতি কবির আকর্ষণ, বিশেষ করে কবির প্রিয় ভিটে ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও এই অস্খলিত ভালবাসা একটি প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। এ ভালবাসার স্বরূপ কি? এ কি পতঙ্গের অগ্নিশিখার রূপমুগ্ধ আত্মধ্বংসের আকুতি? কুমুদরঞ্জনের কবিচিত্তের স্বরূপ উপলব্ধ হলে এ প্রশ্ন খুব বড় হয়ে ওঠে না। কুমুদরঞ্জনের রূপ-তৃষ্ণা কোনকালেই এত প্রবল ছিল না। আসলে যে কারণে পল্লীবাংলা বিশেষ করে উজানি-কোগ্রামের প্রকৃতি ও মানুষ সব দোষগুণ নিরপেক্ষ ভাবেই, সব সামান্যতা তুচ্ছতা সত্ত্বেও তাঁর এত প্রিয়, যে ভালবাসা

বর্তমানের গ্রামজীবনের সর্বব্যাপী বাস্তব অবক্ষয়কে তাঁর চোখ থেকে আড়াল করে রেখেছে সে ভালবাসা অজয় নদের সর্বধ্বংসী বন্যা বা শীতশীর্ণ ক্ষীণধারাকে সমভাবেই বরণ করেছে। তবে সমভাবে শব্দটি কিছু অতিশয়োক্তি। কারণ শেষ পর্যন্ত কুমুদরঞ্জনের শান্তিপ্রিয় কবি-মন শীতের অজয়ের মাহাত্ম্যকেই স্বীকার করে নিয়েছে। বন্যাক্ষুব্ধ অজয় এবং শীতের শীর্ণ সলিল ধারাকে তিনি যথাক্রমে চণ্ডাশোক ও ধর্মাশোকের সঙ্গে উপমিত করেছেন। শীতে—

খসিয়াছে তার দম্ভের নির্ম্মোক,
ভিক্ষু হয়েছে আজিকে চণ্ডাশোক,
কণ্ঠে তাহার নির্ব্বাণ সঙ্গীত।

॥ চার ॥

গ্রামের অতি সাধারণ ফুল-লতা-পাতা, পাখি আর পতঙ্গের দল তাঁকে আকর্ষণ করেছে। কবি ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতার মাধ্যমে এই ভুঁইচাঁপা, অলি, জুঁই, প্রজাপতি, ফিঙে আর টুনটুনিদের রাজ্যে মিলে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একবার "কুরচিকে" লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে ভ্রমর, শুনি নাকি, তারে কবি করেছে ভৎর্সনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে।

কুমুদরঞ্জনও এমনি সব ফুলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন কাব্যরাজ্যে যাদের প্রবেশ অবারিত নয়। কিন্তু আকন্দ, জবা, চম্পা, আফিমের ফুল প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণে যেখানে সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্রোহী মনোবৃত্তির পরিচয় মিলেছে, সেখানে কুমুদরঞ্জনের ভুঁইচাঁপা, জুঁই, তৃণকুসুমের প্রতি ভালবাসায় ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুর প্রতি কবির হৃদয়প্রবণতার প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে কুরচি-কণ্টিকারীর মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্যের

আভাস দেখেছেন, প্রমথ চৌধুরীর কাঁঠালীচাঁপা, গোলাপ আর রজনী-গন্ধায় যেখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রীতি ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ হয়েছে, যতীন্দ্রনাথ যেখানে কেতকীকে গভীর রাত্রে মনে করেছেন—

আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি !

সেখানে কুমুদরঞ্জন সহজভাবে এই সব ফুলেদের ক্ষুদ্র সৌন্দর্যটুকু আস্বাদ করে তৃপ্ত হয়েছেন।

ভুঁইচাঁপার কোমল শুভ্রমূর্তি কবির চোখ দুটি জুড়িয়ে দেয়। মনে হয় যেন বরুণরাণী সলিল থেকে নেয়ে উঠল, কিংবা কোন রাগিণীর মূর্তি গীত থেকে মাথা তুলল। বর্ষা-সখীর শুভ্রহাসি যেন জমাট বেঁধে ফুটে উঠেছে ভুঁইচাঁপা হয়ে, আর কবির চরম উপমাটি হল—

তুলট পুঁথির মলাট ভেঙে শকুন্তলা বেরিয়ে এল।

শকুন্তলার নম্র কোমলতা ভুঁইচাঁপার শান্ত রূপের মধ্য থেকে ব্যঞ্জিত হবার মত। কিন্তু "জুঁই" ফুলকে "অনুরাগের পথের সাথী আমার 'রামী' তুই" বলে উল্লেখ করায় কবির বৈষ্ণব রসাপ্লুত ভক্তিপ্রণত চিত্তই প্রাধান্য পেয়েছে। জুঁই ফুলে রামীর সহজিয়া প্রেমসাধনার তীব্র গভীরতা কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধে জড়িত হয়েই দেখা দেয় নি। "ফাটলের ফুল" কবিতায় নুরজাহানের উপমা আনা হয়েছে। পরিবেশগত কিছু মিল থাকলেও 'নুরজাহান'-এই নামটি যে মাদকতাময় তীব্র জ্বালাপূর্ণ ও বিদ্যুৎদীপ্ত সৌন্দর্যের আভাস বয়ে আনে ফাটলের ফুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় বুঝে ওঠা যায় না। একটি বাদলরাত্রে নীরস প্রাচারের কঠিন গাত্রে ফুটে ওঠা ফুলটির দিকে তাকিয়ে কবি বলেছেন—"একটি নিশির শব-সাধনায় এমন মহাসিদ্ধি!" আলোচ্য কবিতাগুলিতে সেই শবসাধনার পরিচয় নেই, তাই এই ক্ষুদ্র ফুলের সহজ সৌন্দর্যের মধ্যে কোন মহাসিদ্ধির সন্ধান পাই না। কুমুদরঞ্জন সৌন্দর্যবোধ ও

প্রকৃতি বোধের কোন "মহা" সিদ্ধিতে পৌঁছান নি, যে সিদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন তাও সহজাত বলেই মনে হয়, কারণ কঠিন কৃচ্ছ্রতার পথ বেয়ে তা আসে নি। ক্ষুদ্র তৃণকুসুমকে দেখে কবির আনন্দ কয়েকটি সরল উপমাত্মক চিত্রে ধরা পড়েছে—

তুই বুঝিরে ফুলের বাড়ীর ফুল,
মুক্তা প্রবাল পুঁতির দেশের পরী।
নীহারিকার সখের ছোট ছুল্
প্রজাপতির হাতের কারিগরি।

সমাপ্তির পংক্তি দুটিতে কবি এই ক্ষুদ্র তৃণকুসুমকে কমল-পারিজাতের ভাই বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন কুরূচির মধ্যে বিশ্ব-সৌন্দর্যের লীলার প্রতিফলন অনুভব করে বলেছেন—

সে-নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
সে-নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ;

সেই প্রত্যয়সিদ্ধ রূপনির্মিতি নেই কুমুদরঞ্জনের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ে—

ক্ষুদ্র বলে দুঃখ যে তোর নাই
তুই যে কমল পারিজাতের ভাই।

আসলে আপনার ভাললাগাটাকেই কবি একটু জোরে বলতে চান। তাই কমল-পারিজাতের সঙ্গে তুলনার আয়োজন।

"কাশের আশ" কবিতায় মূল সুরটি লঘু কৌতুকের। কাশগুচ্ছ আপন ক্ষুদ্র স্বরূপে সন্তুষ্ট নয়। অসীম আকাশের নীলের হাতছানি তাকে ব্যাকুল করে। কুমুদরঞ্জন এই ব্যাকুলতার স্বরূপ বোঝেন না, তাই কিছু ব্যঙ্গ তাঁর ভাষারূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—

গোরুর-গাড়ীর কাটতো সুখে দিন,—
লাগলো এরোপ্লেনের কি ইঞ্জিন ?
বলছে তারে ছোট্ট
ওঠ্‌রে উধাও ওঠ্‌
পক্ষীরাজের রোগ বড় সঙ্গীন।

কবির মনোবৃত্তির মৃত্তিকার-নৈকট্য এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"রোগশয্যায়" কাব্যগ্রন্থে (রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে চড়ুই-পাখি নিয়ে লেখা।) ময়ূরের পুচ্ছে, কোকিল-পাপিয়ার কূজনে-গুঞ্জনে যাঁর রূপ-রসসম্ভোগের পাত্র বারংবার পূর্ণ হয়েছে তাঁর পক্ষে চড়ুই বন্দনা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। মনে হয় রোগজীর্ণ চেতনার স্তিমিত কল্পনা এবং রোমান্টিক চেতনার প্রতি উচ্চারিত বক্র বিদ্রূপই এ জাতীয় কবিতার জন্ম দিয়েছে।—

যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বকশিশ ;
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম সুর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি—
সকল পাখী ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার কর' না তার কিছু,
মান' নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচু নিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কি কৌতুকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চড়ুইয়ের মধ্যে তিনি "সহজ প্রাণের বাণী" শুনতে পেয়েছেন, "সকল জীবের দিনের আলো" দেখতে পেয়েছেন।

কুমুদরঞ্জন কিন্তু কোন বিশেষ সাময়িক চেতনার বশবর্তী হয়ে "টুনটুনি", "ফিঙা"কে আমন্ত্রণ জানান নি। এদের তিনি নিকট প্রতিবেশী। সহজেই এদের সঙ্গে আপন প্রাণের সুর মিলিয়েছেন।

ফিঙার ডাকে মাধুর্য নেই। কিন্তু কাঁসরের মাধুর্যহীন বাদ্য ব্যতীত যেমন আরতি সম্পূর্ণ হয় না, ফিঙার কর্কশ স্বর ছাড়া তেমনি বর্ষার আয়োজনও অপূর্ণ। এদের তালমানহীন নৃত্য কবির কাছে আনন্দ-উন্মাদনার সংবাদ বয়ে আনে। অনেক ফিঙার মিলিত কলরব কবির কাছে পূজাপ্রাঙ্গণে এক ঝাঁক শিশুর আনন্দিত কোলাহলের কথাই মনে করিয়ে দেয়—

জমা হয়ে যত ফিঙা
সজোরে বাজাও শিঙা,
পূজা-অঙ্গনে যেন শিশুদের কলরব কোলাহল।

অবশ্য ফিঙাদের কথা তাঁকে জগবন্ধুর পুণ্যাভিষেকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, টুনটুনির আনন্দ "জন্মাষ্টমীর মিছিল", "জগন্নাথের রথ" প্রভৃতির উপলব্ধি বয়ে এনেছে। এ জাতীয় বিবৃতিতে কবির ভক্তি-প্রাণতা ফুটলেও রূপচেতনা স্খলিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে "অলির নিমন্ত্রণ" লঘুতরল fancy জাতীয় কল্পনার মিষ্টি সুরে সার্থক—

আয় রে অলি আয় রে অলি,
মনের বনের চৌদিকে মোর ফুটলো কলি, ফুটলো কলি।
আয় রে মধুর গুনগুনিয়া
সারঙ-সুরের জাল বুনিয়া,
নিমন্ত্রণ আজ করছে তোরে সুসজ্জিত বনস্থলী।

এ জাতীয় কবিতার মধ্যে একটি সহজ করুণ ও প্রীতিস্নিগ্ধ ভাবরূপের সৃষ্টিতে "প্রজাপতির মৃত্যু" সার্থক রচনা। শ্লোকের মত এই ক্ষুদ্র কবিতায় বর্ণ-চেতনার (Colour sense) যে পরিচয় কবি

দিয়েছেন তাও বিস্ময়কর। প্রজাপতি করবীকুঞ্জে সবুজ পাতায় মণি-উজ্জ্বল দুটি ক্ষুদ্র ডিম রেখে শেষ বিদায় দৃষ্টিতে স্নেহের অমৃত বর্ষণ করে ঝরে পড়ে গেল। আপন সন্তানের জন্য স্নেহ এবং প্রাণকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল।—

(প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে,
করবী-কুঞ্জে একটি সবুজ পাতে,
মণি-সন্নিভ দুইটি ডিম্ব রাখি'
বারেক ফিরালো মৃত্যু-আঁধার আঁখি।)
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনি মরি,
সুত মঙ্গল-কামনায় দিল ভরি'।
স্নেহ-ভাণ্ডারে শঙ্কিত শত-নিধি,
নিঃশেষ করি' ঢেলে দিল যেন হৃদি।
সময় আসিল কাঁপিল করবীশাখা
মৃত প্রজাপতি ঢলিয়া পড়িল পাখা।

কাব্যমূল্যের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় কুমুদরঞ্জনের গ্রামে বাস করা সার্থক হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম্যপ্রকৃতির বুকের মধ্যে বাস করলেই এ জাতীয় অতি ক্ষুদ্র, অতি সুন্দর এবং স্নিগ্ধ করুণ দৃশ্য চোখে পড়ে। নীরবে শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করা অথচ নতুন জীবনের প্রতি ভালবাসার গভীর স্বপ্নালু মোহাবেশ এ কবিতার রূপরচনায় সমন্বিত হয়েছে। ভাবাবেগের রঙ কোথাও চড়ে নি, অথচ আস্বাদ একটুও ফিকে নয়; প্রাচীন চীনা কবিতার সঙ্গে এই রচনাটিকে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

"দুটি খরগোস" কবিতায়ও ক্ষুদ্র নিরীহ গ্রামীণ দুটি প্রাণীর জীবন-মৃত্যুর চিত্র ভালবাসার কোমল বর্ণে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; অথচ এ রঙ আদৌ চড়া নয়, বর্ণনার বস্তুরূপের মধ্যে এই বর্ণ যেন

আপনাকে লুপ্ত করে দিয়েছে, কিন্তু পাঠকের চিত্তে তার মিঠে রেশটি একটি মৃদু আন্দোলন তোলে—

বনের কোনে সুখে শশক ছিল দুটি
দেখেছি কতদিন সাঁজে,
তৃণের মূলগুলি নীরবে খে'ত তুলি
বসিয়া তৃণদল মাঝে।
পায়ের সাড়া পেলে শ্রবণ দুটি তুলে
সভয়ে যেত দূরে সরি,
তাদের আপনার ছিল এ মাঠখান,
ছিল অনেক দিন ধরি।

॥ **পাঁচ** ॥

কুমুদরঞ্জনের ঋতুবিষয়ক কবিতার সংখ্যা কম। কোন বিশিষ্ট ঋতুদর্শন তাঁর কবিতায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে ঋতুর কাজ মানুষের মনে প্রেম জাগানো। কুমুদরঞ্জনের প্রেম-দৃষ্টিতে লীলা বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। কাজেই ঋতুকে আমন্ত্রণ জানাবার প্রয়োজন কবি অনুভব করেন নি। বিশেষ করে প্রেম-প্রগলভতার ঋতু বসন্ত তাঁর কবিতায় আদৌ গুরুত্ব পায় নি। তুলনামূলকভাবে শীতের প্রতি তাঁর কিছু আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। কবিতার রাজ্যে শীত সাধারণত অবহেলিত ঋতু। কুমুদরঞ্জনের বার্ধক্যচেতনাই শীতঋতুর বন্দনাগান রচনায় কবিকে প্ররোচিত করেছে কিনা তা ভাববার মত। কুমুদরঞ্জনের বর্ণনায় শীত, সব হারাবার ঋতু নয়—

সেথায় স্নিগ্ধ শুভ্র শেফালি শিশিরের জলে নায়,
ঝিকিমিকি করে জল-কণাগুলি কমলের আঙিনায়।

গলে শোভে লতিকার
দ্রব হীরকের হার,
দূর্ব্বাদলের মখমল ছায় মুঠা মুঠা মুকুতায়।
—(শিশিরের দেশে)।

আমার মনে হয় বাংলাদেশের শীত গাছে-লতায়-ফুলে-রঙে বিবর্ণ মৃত্যুর ঋতু নয়, সৌন্দর্যের ও আনন্দের ঋতু। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বাংলার শীতের এই সত্যকার রূপটি এখানে ধরা পড়েছে। ইংরেজী কবিদের কাছে শীত মৃত্যু-বিবর্ণ রিক্ততার বাণী বহন করে আনে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ইংলণ্ডের প্রকৃতির চেয়ে প্রায় সর্বাংশে পৃথক একথা স্বীকার করতে হয়।

বর্ষাকে নিয়েও কবির কিছু কিছু কবিতা আছে। বাংলার বর্ষার বিচিত্র রূপ। কখনও ইল্‌শেগুঁড়ির লঘু খেয়ালীপনা, কখনও শ্রাবণের ঘন ধারাবর্ষণ, কখনও ভাদ্র-আশ্বিনের মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলা। রবীন্দ্রনাথ মানবের বিরহবেদনার প্রতীক-দ্যোতনা খুঁজেছেন শ্রাবণের ঘন বর্ষায়। কুমুদরঞ্জনের বর্ষায় প্রবলতা কম, বাইরের পৃথিবীকে ঢেকে একাকার করে দেবার চিত্র বড় নেই। তাঁর ভাল লাগে আকাশের "মেঘকরা দেখতে—

এ 'মেঘকরা' কান্তিভরা সত্যি গো ;
মিথ্যে এতে নাইকো তো একরত্তি গো।
দেখি নাই কি ক'রে হেলা,
আকাশ ঘিরে এ জাল ফেলা—
সারা গগন জলদজালে ভর্ত্তি গো।

একটা চপল লঘু সুর এ চিত্রের চারপাশে ব্যঞ্জিত। কবি কুমুদরঞ্জন বর্ষার সান্দ্র গম্ভীর রূপের উপাসনা করে বলতে পারেন না "অন্ধকারকে ঠিক মতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে

এই শ্রাবণের ধারা পতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর ক'রে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার"।—[রবীন্দ্রনাথ : শ্রাবণ-সন্ধ্যা] কারণ তার কবি-পুরুষের আকর্ষণ সহজ, সরল এবং তরলের দিকে। কাজেই বৃষ্টির বন্দনা গানে তিনি বলেন—

যুগের যুগের নটেরা গীত-নৃত্যে গো
অভিনয় কি দেখায় সলিল-তীর্থে গো!
বাদ্য, নৃত্য, দৃশ্য, রঙ্গ
জলসা জলের—জলতরঙ্গ
ছাপ রেখে যায় মৃৎ-অঙ্গে আর চিত্তে গো।

বর্ষার সঙ্গে জড়িয়ে প্রেমমিলনের আকুতি বা বিরহের উপলব্ধি বড় হয়ে ওঠে না কবির কাব্যে। তিনি বাংলার গ্রাম্য মানুষের বর্ষা যাপনের বাস্তব চিত্র আঁকেন। জলভরা নালায় শিশুদের কাগজের নৌকা ভাসানো, 'মাথালি' নিয়ে কৃষকের নিজ বাড়ি ফেরা, যুবকদলের 'পলুই' নিয়ে পথে মাঠে মাছ ধরার উৎসাহে মেতে ওঠা দেখতেই কবির ভাল লাগে। ক্বচিৎ কখনও যদি কবি হঠাৎ বলে বসেন—

থরে থরে আজ জলদের গায়,
যে দেশের কথা ফুটে উঠে হায়,
সেই দূর দেশে ফিরে যেতে চায় পিঞ্জরে বাঁধা প্রাণ।

তখন তাকে রবীন্দ্রপ্রভাবজাত বহিরঙ্গ বাণী বলেই মনে হয়, কবির অন্তর-পুরুষের সায় তাতে মেলে না।

॥ ছয় ॥

কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রীতির মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষ খুব কাছাকাছি। কবির পল্লাপ্রীতি মানবভাবমুক্ত নয়। বিহারীলাল গ্রাম্য কৃষককে কখনো কখনো অভিনন্দিত করলেও প্রকৃতির নির্জন রূপই তাঁর প্রিয়। মানুষ জন্তুকে তিনি ভয় পান বলেও জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবতা তার প্রাত্যহিক জীবনচর্যা-উত্তর বিশুদ্ধ সত্তার সাধনা করেছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের মানুষেরা তাঁর প্রিয় নিসর্গবস্তুগুলির মত একান্তই সাধারণ। পশ্চিমা চাকর কালিয়া, অজয়ের বুকের মাঝি অখিল, বেত্রমাত্রসম্বল পাঠশালার পণ্ডিত রাম ম'শায়, শ্বশুরালয়ে যাত্রাকালে মাতৃহারা উজানি-কন্যা বিমলা এমনি অতি নগণ্য মানুষের দল তাঁর কবিতায় ভীড় করে আছে। এদের চরিত্রের কোন মাহাত্ম্য বা জীবন-ঘটনার কোন গৌরব কবিকে উদ্বুদ্ধ করে নি। এরা উজানির মানুষ—গ্রামকে এরা ভালবাসে; দোষ-গুণে জড়িত এই মানুষগুলি তাই যেন স্বাভাবিক নিয়মেই কুমুদরঞ্জনের প্রিয় হয়ে উঠেছে। পাঠশালার ভুঁদুবাবুর কান্না অথবা গ্রামপ্রান্তের সাঁওতাল যুবতীর নিকষ কালো প্রস্তর-কঠিন যৌবন তাঁকে সমভাবে আকৃষ্ট করেছে। গ্রামের "নিষ্কর্মা" যুবকদলকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন—

পাড়াগাঁয়ের অকেজো দল গ্রামকে তারা আপন জানে,
জট্‌লা ক'রে একসাথে সব দিনরাত্তির তামাক টানে।
বকুলতলে চাটাই পেতে সারা দুপুর খেলছে পাশা,
উচ্চহাসে ফাটায় পাড়া সংশোধনের নাইকো আশা।
কবির গানের আখড়া দেওয়া, খোল বাজায়ে নৃত্য করা,
মতিরায়ের নতুন পালা একসঙ্গে সবাই পড়া।
জরুরী কাজ এ-সব তাদের বকুনি খায় ফিরলে ঘরে,
তবু তাদের ভক্ত আমি, দরদ আমার তাদের তরে।

মামলা-মোকদ্দমা, স্বার্থের হানাহানি, দারিদ্র্য যে এ গ্রাম-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি তা নয়। কিন্তু বাস্তবের এই রূঢ় আঘাতকে কবি আপন অন্তরের এক মায়া অঞ্জনের মধ্য দিয়ে দেখেছেন, কখনও একটু ম্লান বেদনার রেশ মাত্র তাঁর কবিতার শব্দচিত্রে জড়িয়ে থেকে গিয়েছে। "ঘোষালপুকুর" বিক্রী হয়ে যাওয়ার পরে তীরের তালগাছের নীচে দুটি পাকা তাল পড়েছিল। টুনী সেটি কুড়িয়ে নিতে অন্য বালক এসে বলল যে পুকুর আর গাছ তারা কিনে নিয়েছে। তখন—

তাল দু'টি এতক্ষণ ধরি,
বুকে চাপি' রেখেছিল টুনী—
নামায়ে রাখিল ধীরে ধীরে
শুধু এই দু'টি কথা শুনি।

এই বেদনার স্পর্শেই কুমুদরঞ্জন গ্রাম্যজীবনের স্বার্থ-সংঘাতের বাস্তবের ঋণ শোধ করেছেন। অন্যত্র এক অন্ধ আদর্শবাদ তাঁর বস্তুচিত্রকে ঢেকেছে। তাঁর কবিতার জমিদারপুত্র "ভিটে ছাড়া" প্রজাকে আবার সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে গ্রামে ডেকে আনে, ভঙ্গুরপ্রায় নবাব বংশের কাছে আপন প্রাপ্য ঋণের দলিলপত্র জ্বালিয়ে মহাজন "দেয়ালী" উৎসব করে। জমিদারী বিকিয়ে বৌরাণী "গ্রামের মায়া" ত্যাগ করে যখন চলে যেতে চান তখন প্রজাদের আহ্বান তাঁকে ফিরিয়ে আনে—

দল বেঁধে সব তোমার প্রজা বলছে কথা রাখো,
মাটি গেছে মানুষ নিয়েই না হয় মাগো থাকো।
রাজ্য গেছে, মুকুট গেছে, শনির শাপে জানি—
তবু তুমি চিন্তাদেবী কাঠুরেদের রাণী।

ঘটনা হিসেবে এদের তথ্যগত যথার্থতা হয়ত কবির গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে। একজন মহাজনের সহৃদয়তা, একজন জমিদারের করুণা বা একজন সম্পত্তিহীনা জমিদারবধূর প্রতি প্রজাদের

নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিক চরিত্রের প্রকাশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাছে এরাই গ্রাম্য-সমাজজীবনের সাধারণ সত্য—এরাই বাস্তব। অথচ বাংলার জমিদারী প্রথার ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বাস্তবতার অন্যরূপই গ্রাম্যজীবনে প্রকট। কুমুদরঞ্জন সুদূর কামনা বা দার্শনিকতার দ্বারা গ্রাম্যজীবনের বস্তুসত্যকে অতিক্রম করেন নি, কল্পনার বর্ণাঢ্যতার সাহায্যে তাকে আবৃত করেন নি, এক স্বপ্নভরা আদর্শবাদের সাহায্যে তার বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে "ভাঙ্গা মসজিদ" প্রভৃতি দু একটি কবিতায় গ্রাম্যজীবনের ভঙ্গুরতার চিত্র একটি মৃদু দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতাটি কুমুদরঞ্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা রূপে গণ্য হবার যোগ্য। ভাঙ্গা মসজিদের মধ্যে যেন গ্রাম জীবনের অতীত প্রাণময়তা এবং বর্তমান প্রাণহীনতা প্রতীক-দ্যোতনা পেয়েছে। অথচ অত্যন্ত সরল বাক্যে সহজ শব্দে গ্রাম্য ভাঙ্গা মসজিদটির চিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।—

গাজি সাহেবের সেই সুন্দর ভবন খানি
কে না চেনে, এ পথে যে যায়,
আজ তার আধখানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে
আধ-খানা কুম্বরের গায়।

জনকোলাহল থেমে গেছে আজ, প্রহরী নেই দ্বারে, মসজিদের মিনারে মিনারে অশথের শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত, গাছের ডালে ডালে কাকের অসংখ্য বাসা, ঈদের দিনেও তার জন-শূন্যতা ঘোচে না। এই দীন নির্জনতাই বর্তমান গ্রাম্য-বাংলার বেদনা। কবিতাটির শেষ দিকে একটু অলৌকিকের স্পর্শ আনার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভৌতিক রস সেখানেও প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি, প্রীতিরসেই তা নিমজ্জিত হয়েছে—

ঝরা ফুল পাতাগুলি কে যেন সরায়ে দেছে
আঙিনা তেমনি তকৃতকে।
সেই বুড়া হাফেজের চেনা গলা কত রাত
সভয়ে শুনেছে গ্রামবাসী,
অজু করিবার ঠাঁয়ে সদ্য সলিলের ধারা
প্রভাতে দেখেছে সবে আসি।

কবি না জেনে নিজের প্রাণের কথা এখানে বলেছেন। বাস্তবতা-জীর্ণ গ্রামের বুক থেকে সযত্নে ঝরাপাতা সরিয়ে স্বয়ং কবিই যেন আপন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাকে পরিস্কার তকৃতকে করে রাখছেন। বুড়া হাফেজের গলার স্বরে চম্‌কে না উঠে কবি তাকেই জীবন্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। পরিত্যক্ত মসজিদের অজু করার স্থানে সলিল ধারা দেখে আঁতকে না উঠে তার সজল প্রাণরসটুকুকেই যেন বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন। কাব্যে এ জাতীয় ভালবাসারও যেন একটা স্নিগ্ধ আস্বাদ আছে, কিন্তু কবির এই সাধনার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা আমাদের বেদনার্ত করে তোলে।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

পারাবত-প্রেম

সুশীতল-ধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক্ ঢাকা তোমাদের গৃহখানি
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি,
ছোট এই আশা সুখ,
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।
—প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রথমা

॥ এক ॥

উনিশের শতকে বাংলা কাব্য-উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আখ্যানকাব্য কিংবা উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টিই মুখ্য। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের পটভূমিতে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বহু বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে। বিহারীলাল থেকে বাংলা গীতিকবিতায় যে নতুন সুরের জন্ম দাম্পত্য প্রেমের ভূমিকা সেখানেও নগণ্য নয়। বিহারীলাল তাঁর "সারদামঙ্গল" ও "সাধের আসনে" যে তত্ত্বরূপিণীর বন্দনা গান করেছেন, তিনি কবির কাব্য-লক্ষ্মী এবং বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী হলেও কবি বারংবার তাঁকে আপন মর্তপ্রেয়সীর সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন। কখনো আপন নিদ্রিতা পত্নীর মুখে বিশ্বলক্ষ্মীর প্রতিবিম্ব দেখে বিস্ময়চকিত প্রশ্ন করেছেন—জায়ারূপে এ কে তাঁর গৃহে অধিষ্ঠিত? অক্ষয় বড়াল-সুরেন্দ্রনাথ বা দেবেন্দ্রনাথেও দাম্পত্য প্রেমই

লিরিক কবিতার বিচিত্রতা ও রূপসৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। বিহারীলালের মত এঁরা অবশ্য আপন পত্নীর মধ্যে বিশ্বলক্ষ্মীর বিভূতি আবিষ্কার করতে চান নি। কিন্তু এঁদের দাম্পত্য প্রেম সংসার সীমায় বদ্ধ থেকেও কখনো কখনো তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। দেবেন্দ্র-নাথের বস্তুরূপের ইন্দ্রিয়গত আস্বাদের আবেগ-তীব্রতা এক মদির বিহ্বলতার সৃষ্টি করে তাঁর প্রেম-লিরিককে সংসার জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাপুঞ্জ থেকে মুক্তি দিয়েছে। অক্ষয়কুমার পত্নীর মৃত্যুর বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে নিখিল রহস্য-উদ্ভেদের এক দার্শনিক বোধের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমানুভূতির বিচিত্রতার ছবি আছে। মানবীয় কামনা-বাসনা আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাষাচিত্র অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা সর্ব-স্বীকৃত। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য-ধারার প্রথম পর্বে প্রেমিকা নয় প্রেমই উপজীব্য রূপে দেখা দিয়েছে। উত্তর পর্বে "মহুয়া" প্রভৃতি কাব্যে মানবীর উপস্থিতি কিছুটা ঘটেছে একথা ঠিক। কিন্তু পূর্ব বা উত্তর পর্বে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রেম দার্শনিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দেহ-কামনার চিত্র তাঁর কবিতায় আছে, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত "Sublimated" হয়েছে। দুঃখের তত্ত্ব এবং বিরহের দর্শনের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে বিবাহের বন্ধন থেকে দূরেই রেখেছেন। তাঁর কাব্যের "মানসী" কোনকালেই স্পষ্ট মানবী হয়ে উঠতে পারে নি। এক সুদূর লোকবাসিনী অধরার বন্দনাগানে কবি আপন প্রেমগীতির আয়োজন শেষ করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রপূর্ব কবিদের ধারায় কুমুদরঞ্জনের সন্ধান কর্তব্য। প্রেম-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মৌল পার্থক্য।

॥ দুই ॥

কুমুদরঞ্জনের প্রেম-কবিতা সংখ্যায় অল্প। জীবনের যে উপলব্ধির বিচিত্র ভঙ্গি ও ভাব গীতিকবিদের প্রধান উপজীব্যরূপে গণ্য হয়েছে কুমুদরঞ্জনের চিত্তকে তা সহজে আকর্ষণ করতে পারে নি। যৌবনের বর্ণালী-বিকীর্ণ দিনগুলি কবির চেতনাকে যে ততটা উদ্দীপ্ত করে নি তাঁর কবিপ্রকৃতির বিশিষ্টতাই এর কারণ। প্রেমোপলব্ধিতে একদিকে যেমন উদ্দাম মত্ততা, অন্যদিকে তেমনি ঝঞ্ঝা-উত্তীর্ণ প্রশান্তি, সূক্ষ্ম তরঙ্গ-বিকীরণ এবং ইন্দ্রিয় মদির দেহ-কামনার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় নানা রূপের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন যে রূপ ও অনুভূতিকে বিশেষ করে বেছে নেন সেখানে প্রাত্যহিক সরল সুর ধ্বনিত।

দ্বিতীয়ত, কুমুদরঞ্জনের প্রেম-কবিতায় সুদূরের আহ্বান নেই। প্রকৃতি-বিষয়ে অজস্র কবিতা লিখলেও কবি প্রেম উপলব্ধির পটভূমিকায় প্রকৃতি-সৌন্দর্যকে আমন্ত্রণ জানান নি। দূর দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিত, অজানা অপরিচিত সমুদ্র পর্বত অরণ্য তো নয়ই গ্রামের অতি নিকট কুঞ্জবনের জ্যোৎস্না রাত্রির বিশেষ আয়োজনকেও বিশেষভাবে অনুভব করতে তিনি চান নি।

তৃতীয়ত, কবির প্রেম-চেতনা তত্ত্বরহিত, ইন্দ্রিয়-ভাবনারহিত—এমন কি বলা যেতে পারে বিরহ-বেদনার স্পর্শমুক্ত। বিরহের ভূমিকা চিরকালই প্রেম-কবিতায় অধিক। মৃত্যু ব্যতীত বিরহ ব্যাকুলতা কুমুদরঞ্জনের বড চোখে পড়ে না।

চতুর্থত, কবির প্রিয়তমা যে অতিপরিচিতা, অতিনিকটবর্তিনী, প্রত্যহের প্রতি কর্মের মধ্য দিয়ে কবির সঙ্গে যে তার ঘনিষ্ঠতা এজন্য কবির প্রেমরস-সম্ভোগে কোন বাধা ঘটে নি। কবি নিশ্চিন্তচিত্তে নিত্যকার সংসার-সেবার পাত্রে দাম্পত্য প্রেমরস আস্বাদ করেছেন।

পঞ্চমত, কবির প্রেম-কবিতা পরিবার ধর্মের ব্যাপক ভূমিকায়ই

সত্য। গার্হস্থ্য জীবনের সীমা ছাড়িয়ে যাবার আকুতি তাঁর নেই, প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। এমন কি গার্হস্থ্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিপ্রেম কোনরূপ দ্বন্দ্বের সম্পর্কও সৃষ্টি করে নি।

অথচ তিনি ভক্ত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব কবিতায় রাধাপ্রেমের বহু বর্ণবিলসিত চিত্র, মনোভঙ্গির বিচিত্র তরঙ্গ, প্রকৃতি পরিবেশের নিপুণ ব্যবহার, সংসার-ধর্ম উত্তীর্ণ হয়ে, ঘরের ও বাইরের সর্ববিধ বাধা চূর্ণ করে অভিসার যাত্রা তাঁর প্রেমবোধকে পুষ্ট করতে পারে নি এটা বিস্ময়কর! আর বিস্ময়কর বলেই মনে হয় কবির নিজস্ব প্রেমচেতনা আপন স্বল্প ভূমিকায় গ্রাম্যজীবন-সত্যকে এমনভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল যে ধর্মবোধের গভীরতাও কবিচিত্তকে তা থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে নি।

কালিদাস রায়ের কবিতায় এই দাম্পত্য প্রেমেরই ছবি আছে। তবে তিনি বোঝেন যে বর্তমানের জীবনযাত্রার ম্লান প্রত্যহের মধ্যে প্রেম নির্জিত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে একদিন সমস্ত জীবন-সমস্যা যখন একটুখানি কম তীব্র বলে মনে হয়, দেনাশোধের কিছু বন্দোবস্ত হয়, মেয়ে-জামাইয়ের কুশল সংবাদ আসে, রুগ্নশিশু কিছু সুস্থ হয়, তখন কবি যেন এক দুর্লভ অবকাশ পান বলবার—

দিনগুলি আসে আর যায়
ললাটে ভ্রূকুটি হানি' ব্যথা দেয়, কাঁদায়, ভাবায়।
কতকাল পরে এলো স্নিগ্ধ সন্ধ্যা প্রসন্ন নির্মল,
এমন সন্ধ্যারে সখি অনভ্যাসে ক'রো না নিষ্ফল।
এ সন্ধ্যা বিধির দান।

—(দুর্লভ সন্ধ্যা)।

বাস্তবের আঘাতে সংঘাতে দাম্পত্যজীবনেও প্রেম দুর্লভ হয়ে ওঠে—এ তীক্ষ্ণ বাস্তব বোধ কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ধরা পড়ে নি।

কুমুদরঞ্জনে প্রণয়ের "প্রথম কথা" সেবার। প্রেমের বিচিত্র লীলাবিলাসকে সেবায় সংকুচিত করে আনার চিত্র দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রে বেশ সুলভ। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই সেবা প্রেমের স্থান অধিকার করে বসেছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় নারীর উপলব্ধির মধ্যে লজ্জা এবং কর্মের মধ্যে সেবাই গৌরব পেয়েছে। কবি যখন নববধূর সলজ্জ বহিরাবরণ ভেদ করে অন্তরের বার্তা জানতে ব্যগ্র কিন্তু কিছুতেই সেখানে পৌঁছুতে পারছেন না, তখন সেবার প্রথম সুযোগেই বাইরের সমস্ত সংকোচের আবরণ মুহূর্তে অপসারিত হয়, অন্তরলক্ষ্মীর অন্তর কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—

হঠাৎ যেদিন আমার পায়ে ফুটলো ছোট কাঁটা,
'উহু' বলে গেলাম ব'সে অবশ হ'লো পা-টা,
তখন তুমি ত্বরিত এসে হে বালিকা বধূ,
লাজটি ভুলে ঘোমটা তুলে বললে 'আহা' শুধু।
সজল নয়ন জানিয়ে দিল প্রেমের গভীরতা,
ভিতের প্রথম ইটখানিতেই গোটা বাড়ীর কথা।

কবি যাকে 'প্রেমের গভীরতা' বলে পরম নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলছেন তাকে একালের মন আদৌ প্রেম বলে গ্রহণ করতে রাজী হবে কিনা বলা যায় না; কিন্তু এই সহজ বিশ্বাসের রাজ্যই কুমুদরঞ্জনের, প্রেম সেখানে সংসারের নিত্য সেবার আকার ধরেই দেখা দেয়।

তবে কচিৎ কখনো কবি আপনার সংকীর্ণ প্রেমকে চিরন্তনের ধারায় অনুভব করে গৌরবান্বিত করতে চান। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে নর নারীর যে প্রেমলীলা অভিনীত হয়েছে তার ধারায় নিজেদের স্থাপিত করতে ইচ্ছা জাগে—

লাগে না কি ভালো ? মোর ভালো লাগে, ভালো লাগে মোর অতিশয়,
পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে এই নূতনের অভিনয়।

কিন্তু কবি একটি কবিতায় মাত্র দুই স্তবকের বিস্তৃতিতে ("আজিকে রাতি") রাধা-কৃষ্ণ, সাবিত্রী-সত্যবান, চন্দ্রাপীড কাদম্বরী, শিরিন্-ফরহাদ এবং রোমিও-জুলিয়েটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যখন প্রমাণ করতে চান যে 'যুগের যুগের কিশোর-কিশোরী জগতের বর-বধূরা" এ রাতিকে মধুর করে তুলেছে, তখন কবির অতিসচেতন পরিকল্পনা-প্রবণতা এর স্বতঃস্ফূর্তিকে ঢেকে দিয়েছে বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে কল্পনার পাখায় ভর করে কবি দূরে যেতে চান। প্রিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধার কামনা করেন মুখর সমুদ্রের বেলাভূমিতে, কিম্বা বরফ-ঢাকা উত্তর মেরুতে বল্গাহরিণ-পেঙ্গুইনদের প্রতিবেশিত্ব কামনা করেন অথবা কালিদাসের কল্পরাজ্যে গোদাবরীর তীরে বাসন্ত-প্রকৃতির স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাছে এ স্বপ্ন-কৌতুক মাত্র। তিনি একটি বিষয়ে অতি সজাগ—

হায় রে আমি বৃথাই বকি
নড়বে না যে কোথাও সখি,
গৃহই তাহার চৌদ্দ-ভুবন বিশ্ব-চরাচর।
নারায়ণকে যা চেয়েছে
এক ঠাঁইয়েতে সব পেয়েছে,
দূরে যাবার নামেই প্রিয়ার গাত্রে আসে জ্বর।
কল্পনে লো এই ঠিকানাই রইলো অতঃপর।

—(আমাদের ঘর)

কাজেই দূর-অভিযাত্রার কল্পনাকে তিনি কৌতুকের হাস্যে ফিরিয়ে দেন এবং তাতে যে আনন্দ উপভোগ করেন উপরের স্তবকটির শব্দে শব্দে

তার সস্নেহ স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। কাজেই কবি নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন—

কোন অলকার যক্ষ-বালা দক্ষ তুমি মোর প্রিয়ে,

সব কামনার চরম প্রাপ্তি তাঁর বাস্তব দাম্পত্যজীবনের প্রিয়তমার মধ্যে। কাজেই কোন অধরার পেছনে ছুটবার তাগিদ তাঁর থাকবার কথা নয়।

কুমুদরঞ্জনে বিরহ বেদনার অবকাশ কম। মৃত্যুই এঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে। একাধিক কবিতায় সেই বেদনাকে কবি প্রকাশ করেছেন—মৃত্যুর বেদনাকে। তার মধ্যেও কবির স্বভাব-সুলভ প্রশান্ত ভঙ্গিটি জড়িয়ে আছে। সুতীব্র আর্তি নয়, মূক বেদনাই যেন শান্ত সহনশীলতার মধ্যে চিত্রবদ্ধ হয়েছে—

অশ্রু আমার মুক্তা হবে তোমার নোলকে।

—(দূরের যাত্রী।)

"নৌকা-পথে" কবিতাটিতে এই বেদনার চমৎকার প্রকাশ আছে। কবি মাঝিকে ঘাটে নৌকা বাঁধতে নিষেধ করছেন। বিশেষ করে সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে, রক্তরাঙা পটভূমিতে আধা আলো-ছায়ায় যে মায়া জড়ানো তাকে জয় করা যায় না বলে তার অন্তরে কি ব্যাকুলতা! কিন্তু বাইরে উদ্বেলতার অভাব। কবির চিত্তের অশান্তভাব ব্যক্ত হয়েছে নদীর বুকে ভেসে ভেসে না থেমে চলার কামনায়, একটি কোমল আতুর ভাব রূপায়িত হয়েছে বকুলগাছ, ঘাটছোঁয়া জলের সীমা আর নাম-না-বলা পল্লীবালার কাঁকনের শব্দে—

মাঝি—ভিড়ায়োনা চলুক তরী নদীর মাঝে,
তরী—এ ঘাটেতে বাঁধবো নাকো আজকে সাঁজে।
ওই ঘাটে ওই বকুলগাছে,
জলটি যেথায় ছুঁয়ে আছে,
এখনো ওই যে-ঘাটেতে পল্লীবালার কাঁকন বাজে।
তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁজে।

॥ তিন ॥

কুমুদরঞ্জনের প্রেম-কবিতাকে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে দেখবার উপায় নেই। পরিবাররসের আরও নানা বিচিত্র কথার সঙ্গে জড়িয়ে এদের অস্তিত্ব কবির মনে। তাঁর কবিতায় যে প্রেমের গান গাওয়া হয়েছে তা দাম্পত্য সম্পর্কের ; উপরন্তু এই দাম্পত্যলীলা চারপাশের পরিবার জীবনকে আশ্রয় করে, পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে নির্দ্বন্দ্ব ভাবেই আপনাকে বিকশিত করেছে। যে কারণে কবি মুক্তপ্রেমের লীলাবৈচিত্র্যের ও কল্পনা ভিত্তিক দূরত্বের শরিক হতে পারেন নি, সেই একই কারণে প্রেমকে তিনি পরিবার-সম্বন্ধ থেকে পৃথক করে দেখবার কথা ভাবতেও পারেন নি।

পারিবারিক জীবনধারা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। পরিবার জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষের বেদনা-উল্লাসের কথা, আশঙ্কা ও কামনার চিত্র অঙ্কিত করার সুযোগ গল্প-উপন্যাসে আছে। বাংলা দেশের অনেক ঔপন্যাসিকের রচনা পরিবার-কথাকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস ও বড় গল্পে পরিবারতন্ত্র এমনই একটি প্রত্যয় যা পাঠকমনে বিশেষ রসাস্বাদ জাগাতে সক্ষম হয়েছে। পরিবারকে কেন্দ্র করে মান-অভিমান-স্নেহ-সম্প্রীতি-স্বার্থবুদ্ধি-উদারতা মিশ্রণে যে এক ধরনের আস্বাদ্য পদার্থ নির্মিত হতে পারে চিরন্তন সাহিত্যকর্মের দরবারে এবং দেশকাল নিরপেক্ষ মানব সমাজের কাছে তার আবেদনের কথা চিন্তা না করেও বাঙালী পাঠক তা স্বীকার করবে। বাঙালী জীবনে পরিবারধর্মের প্রভাব এখনও প্রবল, বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা চিন্তার প্রভাব সত্ত্বেও একথা মেনে নিতে হয়।

কবিতার ক্ষেত্রে পরিবারজীবন কতদূর ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম সে বিষয়ে প্রশ্ন অনেক বেশি, সন্দেহও তীব্র। কারণ কবিতায় ঘটনা বা

চরিত্রচিত্রণের সুযোগ নেই। বিশেষ করে এই জাতীয় কবিতার সৌন্দর্য-সার্থকতা অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না। তবে মনে রাখা দরকার বাৎসল্যকে অবলম্বন করে পৃথিবীর অনেক পরিণত সাহিত্যেই কিছু কিছু ভাল কবিতা রচিত হয়েছে এবং এই মনোভাবটি নিঃসংশয়ে পরিবারধর্মের বৃন্তে জাত। কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায় বাংলা কবিতার ধারায় উক্ত রসের কিছু রচনা দান করেছেন। তাদের অনেকগুলির মধ্যে একধরনের কাব্যরস আস্বাদ করা যায় বলে আমার বিশ্বাস আছে।

কুমুদরঞ্জন বিশেষ করে পরিবারের অতীতকে সন্ধান করেছেন। একটা স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসের সূত্রে এবং কখনো সেকালীন ও বর্তমানের জীবনের কৌতুকোজ্জ্বল তুলনায় কবির এই কবিতাগুলি বিশিষ্টতা পেয়েছে। কালিদাস রায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটি খুবই স্পষ্ট। কালিদাস রায়ের গার্হস্থ্যজীবন সংক্রান্ত কবিতাগুচ্ছে অতীতের স্মৃতিচারণের শান্ত আনন্দ নয়, বর্তমান পরিবারজীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কলহ করে দুই জায়ের ভিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্ভবত বাঙালী একান্নবর্তী সংসারের প্রধানতম বিপর্যয়। কালিদাস রায়ের কবিতায় তার বাস্তব বেদনাটুকু ধরা পড়েছে—

দুই জায়ে আজ করল কোঁদল নথ নাড়িয়ে জোরে,
দুই ভায়ে তাই পৃথক হলো তুচ্ছ ছুতো ধ'রে।
দুই জায়ে তাই মনের সুখে পাতায় আজি হাস্যমুখে
আপন আপন গৃহস্থালী মনের মতন ক'রে।
দুই বৌয়েরই ঘোমটা আজি গিয়েছে তাই স'রে।—(পৃথক)

কালিদাস রায় অরক্ষণীয়া কন্যার বাস্তব লাঞ্ছনার কথা বলেছেন; মঙ্গল-চণ্ডীর পাথুরে মূর্তি নিয়ে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য

যাতায়াত করে যে-মানুষটি, বঞ্চক বলে যাকে দূর করে দিতে চায় আধুনিক সংশয়ী মন, তাকেও গৃহস্থের কল্যাণের জন্য কিছু দান করতে বলেছেন। কালিদাস রায় গার্হস্থ্যজীবনে বর্তমানের শিক্ষা-সভ্যতা-স্বার্থবোধ এবং অর্থনৈতিক সংকটের আঘাত কিভাবে এসে পড়েছে তার ছবি এঁকেছেন। গৃহ-জীবনের বিপর্যয় যে সংসারটিকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করে, আধুনিক রাষ্ট্র-দেশ-সমাজ-সংসদ যে তাতে অবিচলিত থাকে এই সত্যটিও তিনি ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি—

রাষ্ট্র বল', দেশ বল', সমাজ, সংসদ বল', কারো মোরা নই।···
গৃহই মোদের সব, প্রাণপণে করি তার আঁধার হরণ,
নিভে যদি কার ক্ষতি? গৃহের ক্ষতির আর হয় কি পূরণ॥
—(গৃহদীপ)

কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কবিতায় প্রাধান্য পায় নি বর্তমানের নিষ্ঠুর বাস্তব। বেদনার যে-কথা পরিবার জীবনকে সর্বযুগে ক্লিষ্ট করে তার সুর কবির কবিতায় বেজেছে। যেমন "প্রত্যাবর্তন" কবিতায় বাঙালী মেয়ের অকাল বৈধব্যের কান্না ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান জীবনের ও আদর্শের সংঘাতে বাঙালীর গার্হস্থ্য কাঠামোয় যে-ভাঙ্গন ধরেছে তাকে তিনি সমগ্র অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। তাই অতীতের পরিবার-জীবনের ঐতিহ্য-কথন ও স্মৃতি-চয়ন দ্বারা তাঁর স্থিতিপ্রবণ চিত্তভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন।

কালিদাস রায় এবং কুমুদরঞ্জন উভয়েই প্রাচীনকালের গহনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাদের তুলনা করলেই কবিদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি ধরা পড়বে। কালিদাস রায়ের "মায়ের কাঁকণ" উত্তরাধিকার সূত্রে কবিপ্রিয়ার অধিকারে এল। কিন্তু পুরানো সে কাঁকণে বর্তমানের রুচির চাহিদা মেটে না। গৃহিণীর তাই দাবী—

বাক্সয় রয়েছে বন্ধ—ও জোড়ারে গলিয়ে যা পাও
হালী ফ্যাসানের কিছু তাই দিয়ে নতুন গড়াও।

কবি বারংবার এই দাবী এড়িয়ে গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কন্যাদায়ের সংকটে তাঁকে সেই কঙ্কন স্বর্ণকারের ঘরে দিয়ে আসতে হয়। স্বর্ণকার আগুনে গলিয়ে তার যথার্থ ওজন করার চেষ্টা করতে লাগল। বাস্তব বর্তমানের সংঘাতে অতীতের সেই স্বর্ণালঙ্কার গলে যেতে দেখে কবির প্রাণও যেন অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে—

হাপরের দীর্ঘশ্বাসে রাঙা হ'ল কাঠের আঙার,
রক্ত-নেত্রে তিরস্কার যেন তাহা বহ্নি-দেবতার।
পুড়িতে লাগিল স্বর্ণ—তার সাথে আমার পাঁজর। '

কুমুদরঞ্জনের বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ যে "ফুল ঝুমকা" গড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পত্নীকে দীর্ঘকাল নানা দারিদ্র্য-অনটনের মধ্যেও তাকে উত্তরস্থরীরা শ্রদ্ধায় ও যত্নে রক্ষা করেছে—

বহু ঝঞ্ঝাট অভাব গিয়াছে তাহার উপর দিয়া
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছয়টা মেয়ের বিয়া।
ঝুমকা তবুও অটুট রয়েছে বন্ধক হতে ফিরি'
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়াদের প্রেম আছে তারে ঘিরি'।

যুগের পরিবর্তন, রুচির পার্থক্য অতীতের সেই অলঙ্কারটির মর্যাদায় আঘাত দিতে পারে নি। সে তার গৌরব নিয়ে টিঁকে আছে এবং টিঁকে থাকবে। এই ফুল ঝুমকায় তাঁদের বংশের অতীত দম্পতিদের প্রণয়ের ইতিহাস লেখা আছে, এবং এই-সূত্রে অতীত ও ভবিষ্যৎ বাঁধা পড়বে কবির এই বিশ্বাস নিশ্চিত—

ফুল ঝুমকায় মোদের প্রণয় যাইতেছি 'যখ' দিয়া।
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের নাতির নাতির প্রিয়া।

কুমুদরঞ্জন অতীত দিনের স্মৃতির রেশ টেনে গার্হস্থ্যরস উপভোগ

করেছেন। কখনো পুরানো চিঠির ফাইল, কখনো একখানা বিয়ের ফর্দ, কখনো পুরানো তৈজস আবার কখনো মায়ের শেষ চিঠিখানা কবির রসসৃজনের উপকরণ হয়ে উঠেছে। কবির প্রপিতামহের বৃদ্ধ-প্রপিতামহীর প্রেমকবির কাছে আজ সত্য হয়ে উঠছে। যে বাটায় তিনি পান সেজেছিলেন কবি আজ সেই বাটা থেকে পান খান, তাঁর ব্যবহারের আতরদানিটি সামনেই দেখতে পেয়েছেন, আর বিবাহকালে তাঁর স্বামীর হাতে যে জাঁতি ছিল, যে বরণ-থালায় তাঁকে শ্বশুরালয়ে আহ্বান করা হয়েছিল তা ভাণ্ডার আলো করে আছে, তাঁর ব্যবহার করা মেহগিনি খাট এখনো কবি ব্যবহার করেন। কবি এই বস্তুগুলিকে অবলম্বন করে সেই অতীতবাসিনীর এক রূপমূর্তি গড়ে তোলেন—

নাসায় 'বেশর', সীমন্তে 'সিঁথি', সোনার ঝালর তাহে,
মিহি কাশ্মীরী শাল যে শোভিত গরবিনী তব গায়ে।
কটিতে চন্দ্রহার,
কি বাহার ছিল তার,
অশোক ফুটায়ে চলে যেতে তুমি পাঁইজোর মল পায়ে।

এই মূর্তি গড়তে কিছু কল্পনার প্রয়োজন হলেও, তার পরিমাণ খুব অধিক নয়। এই বৃদ্ধা প্রপিতামহীই দেখতে দেখতে অলকার যক্ষবধূতে পরিণত হয়ে যান—

চারু কর্ণেতে শিরীষ পরিতে অলকেতে কুরুবক
লোধ্র-পরাগে যক্ষবধূ কি সাজিতে হইত সখ?

কিন্তু এ যে কৌতুক মাত্র কবি সে সম্বন্ধে অতি-সচেতন। তাঁর আসল রূপ যে "কলসীকক্ষে সলিল আনিতে" তাতে কবির "সন্দেহ নাই তিল"।

তবে পারিবারিক অতীতের সঙ্গে কবি আপনার অস্তিত্বকে একটি অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ বলে কল্পনা করেন। সেই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীর

সঙ্গে কবি নিজের বাস্তব সম্পর্ককে যেন অনুভব করেন। কবি যেন দিবানিশি তাঁর লাবণ্যের সঙ্গে মিশে একাকার হয়েছেন। তাঁর স্বপ্নে যেন তিনি বারংবার আসা-যাওয়া করেছেন—

"তোমার মনের কামনা যে আমি অনাগত আহ্লাদ।"

সেকেলে তৈজসের সঞ্চয় কবিকে স্মৃতির দরজা দিয়ে পারিবারিক অতীত উৎসব-আর্তনাদের রাজ্যে নিয়ে যায়। কাঁসারী প্রতি মাসে এসে এগুলি বদলে নিতে চায়, কিন্তু কবি কোন্ প্রাণে এদের বদলাবেন। কবির কাছে এরা "গৃহস্থালার তাম্রলিপি, স্নিগ্ধ ইতিহাস।" কবি "বাবার বাবার বিয়ের ফর্দখানা" দেখে কিছু কৌতুক অনুভব করেন। পুরানো চিঠির ফাইলে উত্থান-পতনের নানা টুক্‌রো সংবাদ কখনো বেদনার ক্লিষ্টতা, কখনো স্মিত আনন্দ-হাস্য বয়ে আনে। কিন্তু সর্বদাই একটা প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক পরে জন্মাবার জন্য একটু অকারণ মৃদু আক্ষেপ। "বাবার বাবার" বিয়েতে কবির—

নিত্ বর-হবার ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে পাল্‌কী চ'ড়ে,
হয়নি সেটা হবার তো নয়, জন্মেছি যে অনেক পরে।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

গোপীযন্ত্র

> সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব-কবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে ?
>
> —রবীন্দ্রনাথ : বৈষ্ণব কবিতা।

বাঙালীর ধাতুগত প্রকৃতি যে তান্ত্রিক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; ···কিন্তু একটা ঘটনায় তাহার এই ধাতুগত প্রকৃতি হইতেই একটি গূঢ় রসধারা উৎসারিত হইয়াছিল, এবং আর একটি কারণে সেই রস তান্ত্রিক বাংলার সর্বসমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রথম ঘটনাটি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ; দ্বিতীয়টি বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্যের অভ্যুদয়—অর্থাৎ, বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া এক অপূর্ব হৃদয়-বিধুরতার আকস্মিক প্লাবন। সেই ভাষাই রসসিক্ত হইয়া যে একটি নবরূপ ধারণ করিল তাহাই সমগ্র জাতিকে সমভাবে রসাবিষ্ট করিল ; তাহার সেই আদি ধাতুপ্রকৃতির উপরেই একটা নূতন রসজীবন গড়িয়া উঠিল।

—মোহিতলাল মজুমদার : সাহিত্য-বিতান।

॥ এক ॥

কুমুদরঞ্জন ভক্ত কবি। কবিতার একটি প্রধান বিষয় হিসেবে ধর্ম ও ভক্তির উপকরণ গৃহীত হয় নি, ভক্তি তাঁর কবিপ্রকৃতির মূল ধাতুর

সঙ্গে বিজড়িত। বাংলা কবিতার ধারায় ভক্তি কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। বৈষ্ণব ও অ-বৈষ্ণব উভয় ধারার ভক্তিরসে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য বিশেষভাবে পুষ্ট। এমন কি উনিশের ও বিশের শতকেও কোন কোন অপ্রধান কবির মধ্যে ভক্তিভাবের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের জনসাধারণকে সহজে যে-রসে বশ করা যায় তা হল ভক্তিরস। উনিশের শতকে মানবতার গান গাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নবীনচন্দ্রের 'মহাভারত' নামে বিখ্যাত কাব্যত্রয় বৈষ্ণব ভক্তির রস-প্লাবনে ভাসমান হয়েছিল। প্রধানত এই ভক্তির মূল্যে গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকার জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বতম শিখরে উঠেছিলেন। কাজেই কুমুদরঞ্জনে ভক্তি-ভাবনার আধিক্য দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

কিন্তু "ভক্তিরস" নামক শব্দটির বহুল প্রচলন আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে থাকা সত্ত্বেও কবির ভক্তির প্রকাশমাত্র কাব্য নয়, একথা মনে রেখেই কুমুদরঞ্জনের কবিতার মূল্যবিচারে অগ্রসর হতে হবে। তবে কবির পক্ষে সুবিধা এই যে তিনি যে ধর্মবোধের উপাসক তার জীবন-দৃষ্টি রূপময় জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় না। বৈষ্ণব সাধনা মানবীয় বৃত্তি-অনুভূতিগুলিকেই নতুন মর্যাদা দেয়, তাদের উৎসাদিত করতে বলে না। পৃথিবীর সৌন্দর্যকে মায়া বলে অস্বীকার করা তাঁদের দার্শনিক প্রত্যয়ের অভিপ্রায় নয়। এই কারণে বৈষ্ণবদর্শন কাব্যসৃষ্টির পক্ষে বাধা নয় এ কথা বলা চলে। কুমুদরঞ্জনকে আপন দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কাব্যসৃষ্টির উপযুক্ত মানস আয়ত্ত করতে হয় নি। আপন ভক্তি ও বিশ্বাসে স্থিত থেকেই রূপদর্শন ও রূপসৃজনে তাঁর কবিসত্তা ক্ষমতানুযায়ী সাফল্য লাভ করেছে।

রাজনীতি-সমাজনীতি বা ধর্মবিশ্বাসকে কাব্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবি মনের প্রসার বলা চলে আদিগন্ত। কিন্তু নীতি ও বিশ্বাস কতটা প্রচারের পর্যায়ে থেকে গেল

এবং কতটুকু রূপসৌকর্যে "প্রকাশ" পেল তার উপরেই শেষ পর্যন্ত কোন রচনার কাব্যত্ব নির্ভর করবে। বিশ্বাস ও মতামত রচনার মধ্যে তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

এক। কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ না করে তার বহির্চিত্তের অভিমত মাত্র হতে পারে।

দুই। কবির কবিচিত্ত আপনাকে সেই বিশ্বাসের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত করতে পারে।

তিন। কবির কবিব্যক্তিত্বের সহযোগে সাধারণের বিশ্বাস-মতামত বা সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনা একটা বিশেষ ব্যক্তিক বোধ হয়ে উঠতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে রচনাটি বিবৃতি-বক্তৃতাধর্মী হয়ে পড়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রূপনির্মিতি অপেক্ষাকৃত আন্তরিক, অনুভূতিময় এবং আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। তার কাব্যত্ব অনেকাংশে স্বীকার্য হলেও তৃতীয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিক উপলব্ধিজাত যথার্থ কাব্যশিল্প প্রকাশিত হয়।

কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণবতা ও কাব্যশিল্পের অন্যান্য সম্পর্ক আলোচনায় এই মন্তব্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতই গ্রহণ করা হবে।

॥ দুই ॥

কুমুদরঞ্জন ভক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু বিংশ শতকে দীক্ষিত বৈষ্ণব বংশীয়-গণের মধ্যেও পঞ্চোপাসক হিন্দুর পূজা-অর্চনা, বিশ্বাসের নানা লক্ষণ দেখা যায়। কাজেই বিশ্বাস ও ভক্তির একটা বিস্তৃত উদার পটভূমি এদেশের কোন বিশিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীকে একান্তভাবে গোষ্ঠীক হয়ে থাকতে দেয় না। বর্তমানকালে সনাতন হিন্দুধর্মের বোধে, স্বাদেশিকতা ও বৃহত্তর মানবচেতনার ফলে এই উদারতা একরূপ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বভাবের সঙ্গে এই সরল উদারতার

একটা সহজ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Partisan spirit তার চিহ্নমাত্র এই কবিতে থাকা সম্ভব নয়। মনের আক্রমণোদ্যত ভঙ্গি যে-চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক কুমুদরঞ্জনের অবস্থান তার বিপরীত কোটিতে। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব আচরণ-বিধির ব্যবহারিক দিকের কথা জানি না, কিন্তু এর অন্তর-সম্পদ সম্ভবত কবিকে অনুশীলন দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় নি, তা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বৈষ্ণব আচরণবিধি বলতে বুঝি একটি ভাবালু কোমল রসদৃষ্টি এবং আন্তরিক বিনয়; এবং এই দুটি বস্তুতেই যেন তাঁর সহজ অধিকার ছিল। তৃতীয়ত, বৈষ্ণব রসপর্যায়ের মধ্যে কান্তারসই শ্রেষ্ঠতম বলে ঘোষিত। রাধা-প্রেম-কথায়ই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা সর্বাধিক উল্লাস, বোধ করেছেন। একালের কবিদের কাছেও তার বিচিত্র লীলাতরঙ্গ ও বর্ণবিলাস আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। রাধাপ্রেমের পরকীয়া-ভাব এবং প্রকৃতি-পরিবেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবল চিত্ত-উদ্বেলতা কবিচিত্তের কাছে রূপায়ণযোগ্য বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব ভাবপর্যায়ের মধ্যে প্রধানত শান্ত ও দাস্যভক্তির দৃষ্টিকোণটিকে গ্রহণ করেছেন। শান্ত ভক্তির চিত্ত-আলোড়নের অভাব এবং দাস্যের দীনতা কবির স্বভাবের সঙ্গে বিজড়িত হয়েই আবির্ভূত। চতুর্থত, বৈষ্ণব তত্ত্ববোধের একটি মূল প্রত্যয় তাঁর অন্তর-বাণীর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছে। কচিৎ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যবোধক রূপের বন্দনা তাঁর রচনায় স্থান পেলেও তিনি তাঁর মধুর রূপকেই চরম সত্য বলে জেনেছেন। পঞ্চমত, কবি বিশ্বপৃথিবীর রূপে রূপে, এমন কি সরল সামান্য বস্তুতে ভগবান কৃষ্ণের স্পর্শ অনুভব করেছেন। ক্ষুদ্র তাই তাঁর কাছে অবহেলার উপযোগী তুচ্ছ বস্তু নয়। কুমুদরঞ্জনের জীবনচেতনার পেছনে যদি কোন দর্শন থাকে, তবে তা এই ভক্তির দর্শন। ষষ্ঠত, কুমুদরঞ্জন বাউলদের ধর্ম সাধনায় কতটা অনুরক্ত

বলতে পারি না, কিন্তু বাউলের সহজিয়া সুর তাঁর মধ্যে শোনা যায়। কুমুদরঞ্জনের মধ্যে আসক্তি ও নিরাসক্তির যে চমৎকার সমন্বয়ের কথা বলেছি তার মূল এই বাউল-দৃষ্টিতে এবং অনেকখানি বৈষ্ণব-দর্শনে। জীবনকে ভালবেসেও কবি জীবনের মধ্যে যেন জড়িয়ে যান না। কবির কণ্ঠে আবেগের প্রবল সুর ধ্বনিত হয় না। উজানি-অজয়কে এত ভালবেসেও কবি কত প্রশান্ত! দেশের প্রতি গভীর প্রীতি সত্ত্বেও কবি কি নির্বিরোধী!

॥ তিন ॥

"শাক্ত"-দের হয়ে কুমুদরঞ্জন ভক্তিপ্রণত চিত্তেই বলেছেন—

কান্ত কোমল শান্ত যাহা, তোমরা বাঁটি লও গো সবে,
আমরা লব কঠিন কঠোর বীভৎস যা রুদ্র ভবে।

এর মধ্যে তাঁর উদার মন, সনাতন হিন্দুধর্মের সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। কিন্তু কঠিন, কঠোর, বীভৎস ও রুদ্রের সাধনা তো তাঁর কবিপ্রাণের নয়। তাই কবি রামপ্রসাদের গানের কোমল ধারায় স্নান করে নিশ্চিন্ত হন, যেন আপনার যথার্থ স্থানটি পান। কবি "রামপ্রসাদ"কে লক্ষ্য করে বলছেন—

তুমি আসিবার আগে রাজ-রাজেশ্বরী
শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী ছিল মা মোদের,
মায়েরে মা ক'রে নিলে তুমিই প্রথম
চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রী জগতের।···
ভক্তি আর শক্তি এক নহে ভিন্ন ভেদ
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার,
গান আর প্রাণ তুমি ক'রে দিলে এক,
ভক্তিকে করিয়া দিলে পূজা উপচার।

এই পংক্তিগুলির কাব্যমূল্য হয়ত খুবই কম, এদের প্রচারমূলক বিবৃতি-ধর্ম কাব্যিক রূপকর্মে যে আদৌ বিদ্ধ হয় নি তাও ঠিক, কিন্তু কুমুদরঞ্জন এই সত্য আবিষ্কার করে নিশ্চিন্ত। আবার "অঘোরপন্থী" প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁদের সবায়ের সাধনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যাঁরা কৃচ্ছ্র সাধক, তান্ত্রিক আচারে বিশ্বাসী, বিচিত্র পদ্ধতির অনুরাগী—

অর্ধ দগ্ধ গলিত কন্থাভার,
সদ্য চিতার অস্থি ও অঙ্গার,
করাল করোটি, ধুম্‌রা দুলিছে গলে,
আসব আবেশে ভোর হয়ে যেন চলে।

কিন্তু এই সাধন-পরিবেশে কবির মন কিছুতেই শান্তি পায় না। শেষ পর্যন্ত কবি এক "কাপালিক"-এর কল্পনা করেছেন। সমস্ত প্রলোভন এবং ভীতিও যাঁকে সাধন-চ্যুত করতে পারে নি, জননীরূপী মায়ার আহ্বানে তিনি জীবনের দিকে ফিরে তাকালেন। সিদ্ধিলাভ তাঁর আর ঘটে উঠল না। সেই ভ্রষ্ট কাপালিক আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে আরাধ্যা মঙ্গলামাতা আবির্ভূতা হযে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন—

নহে তোর ব্যর্থ পূজা, দেবগ্রাহ্য সার্থক, সুন্দর,
প্রীতা আমি উঠ বৎস লভ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।···
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্বজননীর স্নেহ সে কখনও পারে না লভিতে।

এই বিশ্বাসে পৌঁছে তবে কবি চিন্তামুক্ত হলেন।

কুমুদরঞ্জনের বাউল-মন অনেকগুলি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। বাউলের মধ্যে একটি সরস আনন্দময় জীবন-উপভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিহীন মুক্তি কামনা পাশাপাশি সহজ সম্বন্ধে বিরাজ করে। জীবনের পথে পথে কবির এই মন "বাউলে"র লঘু-চপল নৃত্য—

নাচের ছিল ভঙ্গী কত ময়ূর ছিল চিত্ত।
মন যে তখন দেহের সাথে করতো সদাই নৃত্য।

কিন্তু এই নৃত্যকে চরম বলে না মেনে, দেহের আবরণকে ত্যাগ করে চরম ও পরমের টানে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া—

যাবার সময় বলতে আমার নাইকো মোটেই লজ্জা,
জীর্ণ আমি ওইটি আমার আসল "আমি"র সজ্জা।
ওতেই আমি জড়িয়ে আছি,
ইচ্ছা যে হয় কেবল নাচি
মনের বাউল লুকিয়ে আছে আজও উহার মাঝ রে॥

"গোপীযন্ত্র" কবিতাটিতে ভাববোধে কবির অন্তর-আকুতির প্রতিফলন এবং রূপনির্মিতির সরল চিত্রকল্পে সার্থকতা এসেছে। কবির এই বাউল-মন তাঁর বৈষ্ণব-বিশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করে নি। বাংলার গ্রামের একতারাধারী বোষ্টমেরা আধা-বাউল আধা-বৈষ্ণব। কবির "কীর্ত্তন-গান" কবিতাটিতে সেই একই আসক্তি-মুক্তির বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। কীর্তনগান যেন তাঁর বদ্ধ হরিণ-আত্মাকে পিয়াল বনের ঘর স্মরণ করিয়ে দিয়েছে,—

কেন থাকি ল'য়ে রূপরস রূপা সোনা,
এ-গান আমারে ক'রে দেয় আনমনা।
মনে হয় আছি হ'য়ে দীনহীন,
কোথা করঙ্ক, কোথা কৌপীন?
কে আমি? কাহার করিতেছি উপাসনা?

কুমুদরঞ্জন সৌন্দর্যের প্রতিটি কণিকায় সেই পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। কি কারণে ভগবান কোন বস্তুকে রূপে-রঙে, আবার কোন বস্তুকে বর্ণহীন কুরূপে আবৃত করেছেন এটাই তাঁর কাছে "রহস্য" কিন্তু কবির কাছে যা রহস্য পাঠকের দৃষ্টিতে তাকে কিন্তু রহস্যময় বলে

মনে হবে না। এ রহস্যবোধ কবির চিন্তায়, রূপরচনায় কোনই রহস্য নেই। ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর কাছে সুন্দর, তার বর্ণ, গন্ধ, গুণ নিরপেক্ষ-ভাবেই সুন্দর। তার মধ্যে বৃহৎকে উপলব্ধ করাতে পারেন নি তিনি পাঠককে, কিন্তু কবির জীবনবোধের কেন্দ্রে যে-প্রত্যয়—ক্ষুদ্রকেও মূল্য দেওয়া—তার পেছনে কবির ধর্মবোধের কি জাতীয় সমর্থন ছিল তার প্রমাণ মেলে। "ভক্তির যুক্তি" কবিতায় বিশ্বদেব শ্রীকৃষ্ণ নয় জগৎ-জননী শ্যামা-মার মহিমা কীর্তিত। কিন্তু প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তুর রূপ সৌন্দর্যকে এই জগৎজননীর দান বলে অনুভব করায় একই মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছে। কবি বলছেন—

সামনেই দেখ দুষ্টু বোলতা সোনালী ঘুন্সী-পরা।
বকের কামিজে কিবা ইস্তিরি যায় না ময়লা করা।
ডোবার যে পানা—তাহারও পোশাকে তাহাতেও ফুল-কাটা;
ওরও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই—ওই যে খেজুর-কাঁটা।

কাজেই এদের জননী শ্যামা-মাই তার ছোট এই ছেলেমেয়েদের এমন সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন। নিরক্ষর চাষার এই ভক্তির যুক্তি কুমুদ-রঞ্জনের বড় ভাল লাগে। ক্ষুদ্র ও সামান্যের প্রতি তাঁর মানস-প্রবণতার একটা ধর্মীয় ব্যাখ্যা তিনি যেন এর মধ্যে খুঁজে পান।

কুমুদরঞ্জনের "বৈষ্ণব-বন্দনা" কবিতায় বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে কিন্তু বিবৃতিধর্মী সে-রচনায় শিল্প-সার্থকতার একান্ত অভাব। অপরপক্ষে "বৈষ্ণব" নামক কবিতায়ও দার্শনিক প্রত্যয়ই অভিব্যক্ত। ঐশ্বর্য নয়, মাধুর্যই বৈষ্ণব-সাধনার নিগূঢ় বার্তা সে কথাটা বলতে গিয়ে কবি রূপরচনায় এমন কোমলতার সঞ্চার করেছেন মাঝে মাঝে যাতে কাব্যরসাস্বাদে বাধা হয় না। কবি বলেছেন—

স্মরণে তাঁর পরশ-মধু, নামে ঝরে পিযুষধারা,
মুগ্ধ মোদের মানস-বধূ, পেয়ে তাদের গীতের সাড়া;

কোথায় কুরুক্ষেত্র কোথা পাঞ্চজন্য যেথায় বাজে,
গাণ্ডীবের ভীম টঙ্কারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে।
আমরা তাহার ধার ধারিনে, খুঁজি কোথা তমাল-ছায়ে,
মিশেছে রাই কনকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

এবং এটাই তাঁর ভক্ত-মনের এবং কবি-মনেরও আসল কথা। তবে ক্বচিৎ কবি কৃষ্ণের রুদ্র রূপেরও বন্দনা করেছেন—

বট হে তুমিই বট হে,
পাঞ্চজন্য কম্বুনিনাদ পশিছে কর্ণপটহে।
নহে আনন্দ, নহে সৎ চিৎ,
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ,
নূতন যুগের করিতে সূচনা হ'লে প্রলয়ের নট হে।
—(এহ্যেহি)

কিন্তু তা সাময়িক মাত্র। ভগবানের প্রলয় রূপের আহ্বান অপেক্ষা ভক্ত-সাধুর পদরেণুতে "প্রণতি" জানাতেই তাঁর আনন্দ। তাঁদের "চরণে শির লুটাতে"ই কবি ভালবাসেন এই বিনয়ে, "ভৃত্য" বলে নিজেকে অনুভব করায় কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণবতা প্রকট। কালিদাস রায়ের মত তিনি কিন্তু রাধা-প্রেমকে অবলম্বন করে কবিতা রচনায় উৎসাহ বোধ করেন নি। এখানে বৈষ্ণব মনের উপরেও তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আপনার মুদ্রাঙ্কন রেখেছে। "পূজা", "ভক্ত" প্রভৃতি কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

ক্বচিৎ কবি ভগবানের বাক্‌পথাতীত রূপাতীত মূর্তির কথা স্মরণ করেছেন। কিন্তু সেখানেও ধর্মবোধ এত নিশ্চিত যে রহস্য নেই এবং রোমান্টিক অতৃপ্তি বা কুহেলি-আচ্ছন্নতা ব্যঞ্জিত নয়। "মূক" কবিতায় কবি অনুচ্চারিত মন্ত্রে ভগবানকে পূজা করতে চেয়েছেন। রসেই যাঁর

পরিচয় সেই রসস্বরূপের নাগাল পায না এই মানবরসনা, তাই মূক-পূজার গৌরব ঘোষিত হয়েছে—

ভগবান তুমি শুনি অবর্ণনীয়
ভাষা নাই যার তার স্তব আগে নিয়ো।

কিন্তু ঈশ্বরকে রূপাতীত বলে অনুভব করে কুমুদরঞ্জনের বৈষ্ণব মন তৃপ্তি পায না, কবিমনেরও মূল ভিত্তিটি আশ্রয়হীন হয। এই ভিত্তি হল পৃথিবীর ক্ষুদ্র সামান্য রূপরাজ্যকে শান্তচিত্তে ভালবাসায়, এবং তৃণ-পুষ্প-ধূলিকণার উপরে নিরাসক্ত প্রীতিধারা বর্ষণে; কিন্তু রূপই যদি অস্বীকৃত হয়, ভগবানের রূপাতীত চেতনাই যদি আরাধ্য হয়, কবির চিত্ত ব্যাকুল হয়ে বলে—

না জানিয়া পান-পাত্র কেমনে পান করি মকরন্দ।

কারণ অমৃতময় ভগবান কৃষ্ণ আর পানপাত্র এই বিশ্বরূপ কবির কাছে অচ্ছেদ্য—

বুঝালে জগৎ জগদীশ একই মিটায়ে সকল ধন্দ।

—(অন্ধ)

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

চরৈবেতি

এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশ্চিন্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে ॥

—রবীন্দ্রনাথ।

॥ এক ॥

ভারতীয় কবিদের মৃত্যু-চেতনা প্রাচীন দার্শনিক বোধের দ্বারা অতি সহজে প্রভাবিত হয়েছে। জীর্ণ বাসের মত এই দেহটি পরিত্যাগ করে আমাদের চেতন-আত্মা নবতর দেহরূপ লাভ করে ; মৃত্যু সমাপ্তি নয়—যবনিকা মাত্র। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে মানব-আত্মার অভিযানে মৃত্যুর যবনিকা উন্মোচন করতে হয়। প্রজ্ঞাবানের তাই মৃত্যুতে ভীতি নেই। পুরাতনকে নবীনের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবেই। মৃত্যুর কষ্টিপাথরেই তাই সত্যের পরিচিতি, জীবনের প্রতি ভালবাসার যথার্থ পরিমাপ। কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব-দর্শনে বিশ্বাসী। বাউলদের জীবন-দৃষ্টির সঙ্গেও তাঁর

চিত্তের সামীপ্য আছে। এই আস্তিক্যবাদী ধর্মপ্রাণ কবির দৃষ্টিতে মৃত্যুর যে-রূপ প্রকটিত হবে তার ভারতীয় দর্শনের অতি পরিচিত প্রত্যয় থেকে এমন কিছু দূরবর্তী হওয়া স্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঔপনিষদিক দৃষ্টির অধিকারী হয়েও জীবন ও মৃত্যুকে এমন বিশিষ্ট রূপে অনুভব করেছিলেন যে তা প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক দর্শন বলেই প্রতিভাত হবে। কুমুদরঞ্জনে ব্যক্তি-প্রবণতা তত তীব্র ছিল না। কাজেই প্রচলিত দর্শন-চিন্তায় ব্যক্তি-রঙ লাগলেও ব্যক্তিত্ব তাকে গ্রাস করতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক। রূপ-চেতনায় তাঁর সিদ্ধি যেমন অত্যুচ্চ, দার্শনিকতায় তাঁর ভাব-গভীরতাও সর্বত্রই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দর্শনও তাঁর অজস্র কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে মধুসূদনের মৃত্যু-চেতনা খুবই স্পষ্ট। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন। মৃত্যুর বেদনাকে তীব্র-ভাবে উপলব্ধি করেছেন, মৃত্যুর যবনিকা উত্তোলন করে তিনি হিন্দু বা খ্রীষ্টানদের পৌরাণিক বিশ্বাসের নরককে দেখেছেন, দার্শনিকের দৃষ্টিতে পৌরাণিক-লৌকিক বিশ্বাসকে ভেদ করতে চান নি। কুমুদরঞ্জনে রবীন্দ্রনাথ-সুলভ দার্শনিকতা যেমন নেই, তেমনি মধুসূদনের মত জিজ্ঞাসাহীনও তিনি নন। তাঁর মৃত্যু-জিজ্ঞাসায় তীব্র চিত্ত-বিদীর্ণ ব্যাকুলতা নেই, সত্যোপলব্ধির ঋষিজনোচিত প্রত্যয়ও নেই; অথচ মৃত্যু সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শন চিন্তার প্রকাশ আছে তাঁর কবিতায়।

কুমুদরঞ্জনের কোন কবিতায়ই যেমন তত্ত্ব-দর্শনের গভীরতা নেই, জীবন-বোধের অতলে যেমন তিনি কখনই তলিয়ে যেতে চান নি, তেমনি মৃত্যু-বিষয়ক কবিতায়ও দার্শনিক চিন্তার সাধারণ পরিচয় মাত্র আছে, গভীর তাত্ত্বিক-উপলব্ধি নেই। কবির অন্য ধারার কবিতার মত এই ধারায়ও অনুভূতির আবেগ-কম্পন খুব প্রবল নয়। প্রবলতার এই

অভাবের জন্য কবি-জীবনের বার্ধক্য আদৌ দায়ী নয়, কারণ সর্ববয়সেই কবির মন অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ এবং বার্ধক্য-ভাবনার একটি সুর তাঁর কবিতার নিত্যসাথী।

কুমুদরঞ্জনের এখন পর্যন্ত শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "স্বর্ণসন্ধ্যা"। এই কাব্য প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালে, ১২।১৩ বৎসর পূর্বে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির একটি বড় অংশ কবির ষাট বছর বয়সের বা আরও পরবর্তীকালের রচনা। এই বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু-ভাবনা মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে কবির যৌবনকাল থেকেই, কিন্তু যৌবনে যে-দৃষ্টিতে তিনি মৃত্যুকে দেখেছিলেন বার্ধক্যের দেখায় সে তুলনায় পরিবর্তন যে কত গভীর ছিল রবীন্দ্রকাব্যের একটু সতর্ক পাঠকমাত্র তা জানেন। বার্ধক্যে মৃত্যু-ভাবনা কেবল কল্পনার ধন বা দার্শনিক তত্ত্ববোধ ছিল না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। কবির রূপরচনায় এই পার্থক্যটুকু সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কুমুদরঞ্জনেও অবশ্য "স্বর্ণসন্ধ্যা'য়ই মৃত্যু-ভাবনার কিছু তুলনামূলক আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বহুপূর্বে "বীথি" প্রভৃতি কাব্যেও কবি-কণ্ঠে মৃত্যুর কথা আলোচিত হয়েছে। এই কাব্য ১৩২২ সালে রচিত। কবির বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ-চৌত্রিশ। এর মধ্যে মৃত্যু-ভাবনামূলক "প্রতীক্ষায়" কবিতাটি আবার আরও পূর্বে লেখা হয়েছিল বলে কবি নিজেই মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তবে যৌবনে রচিত এই মৃত্যু-ভাবনার মধ্যে কল্পনা-বিলাসই প্রধান হয়ে উঠেছে।

"মরণ" নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের "অত চুপি চুপি এসে কেন কথা কও" কবিতার প্রভাব স্পষ্ট। কবি রবীন্দ্রনাথের মত মৃত্যুকে মহেশের রুদ্ররূপের সঙ্গে একাকার করে ফেলে বলেছেন—

আপনার বর বেশ লুকাইয়া হে মহেশ
শেষে কি কম্পিত কর সযত্নেতে করিয়া গ্রহণ
দাঁড়াইবে আসিয়া মরণ ?

তবুও এ কবিতায় কুমুদরঞ্জনের কল্পনায় মৃত্যু-সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা প্রধান নয়। তিনটি ভিন্ন চিত্রে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে জীবনের চরম হতাশার মুহূর্তে, যৌবনের অবসানে, প্রেমের অবলুপ্তিতে মৃত্যু কি করে হয়ে দাঁড়ায় মানব মনের শেষ আশ্রয়। প্রেমিকবরের আশাপথ চেয়ে কবি-প্রাণ-বধু যখন ভগ্ন মনোরথ, শোভন মালঞ্চ থেকে যখন ঝরে যায় "বিমল কুসুম অর্ঘ্য নিদারুণ নিরাশার বায়", আর—

তপখিন্ন তনু যবে নিরাশায় তাম্র হবে
দুখ শোক হোমাগ্নিতে শুকাইবে লাবণ্য আমার,
আত্মবন্ধু সখীদল ভগ্ন আশা অবিরল
সমদুখী মোর দুখে ফেলিবেক নয়ন আসার—

তখন কি মৃত্যুর বেশ ধরে সেই প্রিয়তমই এসে হরণ করবে সমস্ত হতাশা, দুঃখভার ? মৃত্যু কি বিরহদগ্ধ রাধার সম্মুখে মুহূর্তের অস্পষ্ট আলোয় উপস্থিত কৃষ্ণ অথবা তপস্যা-ক্লিষ্ট গৌরীর সাধনার সিদ্ধিরূপ মহেশ ?

"প্রতীক্ষায়" কবিতায় রোমান্টিক মৃত্যু-কামনা একটি তরল গীতি-সুরে প্রকাশিত হয়েছে। একটি স্তবকে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে কবিতার আঙিনায় আমন্ত্রণ করে একটু রসাভাসের সৃষ্টি করা হয়েছে—

পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদ জোড়
কাষ্ঠতরী খানি হবে কনক মোর।

তা ছাড়া অন্যত্র ক্লান্ত প্রতীক্ষার একটি সুর এ কবিতাটিকে সার্থকতা দিয়েছে। অস্পষ্টতা নদীর কুহেলি-আচ্ছন্ন অপর তীর থেকে হাতছানি

দিয়ে একটা মৃদু ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলেছে, নিরাশা ও একাকীত্ব এ কবিতার রসাবেদনে বিচিত্রতা জুগিয়েছে—

এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান
নিরাশে কেটে গেল দীরঘ দিনমান।
অদূরে নীলাকাশে,
তপন নিভে আসে,
দিনের আলো ধীরে হল যে অবসান
এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান।

এই পর্বের মৃত্যু-ভাবনা নৈরাশ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়েই দেখা দিয়েছে, বিশিষ্টতা হিসেবে এটুকুই লক্ষণীয়।

॥ দুই ॥

কিছু কিছু কবিতায় মৃত্যুর প্রশ্নটির সঙ্গে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ও পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পৃথিবীতে বারবার যাওয়া-আসা এতই সত্য যে মৃত্যুর বেদনা কবিকে মুহ্যমান করতে পারে না। মৃত্যু ভেদ করে তিনি কোন নতুন অরূপলোকে জেগে উঠবেন না, ইন্দ্রিয়াতীতের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাবেন না, নতুনরূপে—নতুন দেহে ও ব্যক্তিত্বে ফিরে আসবেন এই মাটির পৃথিবীতেই। "জন্মান্তর সঙ্গতি" কবিতায় এই ভালবাসার স্পর্শ এক আশ্চর্য সার্থকতার সৃষ্টি করেছে। কবি বলছেন—

এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি আমি যে অনেকবার।
সে-তারার আলো এখনো রয়েছে যে-তারকা গেছে ডুবে,
মৃগ নাই, মৃগ-নাভির গন্ধ এখনো যায় নি উবে।

কত জনমের আঁখির পরশ রয়েছে রূপের গায়,
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন দাগ রাখিয়াছে তায়।
চেনা চেনা লাগে দেখে—
মাণিক্যহারে রয়েছে আমার বুকের পরশ লেগে।

কুমুদরঞ্জন এই পৃথিবীর অতি সামান্য বস্তুকেও সহজ প্রীতিতে ভালবেসেছেন, অথচ একটা বাউল-বৈরাগ্য তাঁকে আসক্তির নিমজ্জন থেকে সর্বদা কিছু পৃথক করে রেখেছে। "জন্মান্তর সঙ্গতি" কিন্তু কবিকে নিশ্চিন্ত করেছে। এ আসক্তি বেঁধে রাখে না, আবার মৃত্যুতেও এ প্রীতির বিলোপ নেই। বারে বারে আসা ও ভালবাসা এবং আবার চলে যাওয়া—সে কি আবার ভালবাসার আকর্ষণে ফিরে আসার জন্য নয়? রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতায় প্রেম মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছিল—"তুমি নাই"। আর জীবনের শেষ প্রান্তে দার্শনিক প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলেন কবিগুরু—

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন—
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ;
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে॥

কুমুদরঞ্জন এই প্রত্যয়ে পৌঁছান নি, পৌঁছাতে চান নি। অথচ প্রেম বা জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামের কল্পনাও করেন নি। জন্মান্তরবাদে গভীর বিশ্বাসকে সাধারণ হিন্দুধর্মের সত্য থেকে তিনি ব্যক্তিক ভালবাসার সত্যে উন্নীত করে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছেন।

"কুহর" কবিতায়ও "জন্মান্তর সৌহার্দ্দের বাণী" আছে। কবি যেন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বেদনাটি ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়। কুহরের বুকে, খেয়াঘাটে, পাণ্ডুর সৈকতে, নির্জন বনপথে আপনার ভালবাসাটুকু রেখে যাবেন। তারপরে—

যুগ যুগ পরে কোনো স্থলগনে হয়ত হইবে দেখা,
পাথিকের মত পরিচিত তটে আসিয়া দাঁড়াব একা।

শেষদিকের কবিতাগুলিতে স্মৃতিচয়ন এবং আত্মবিশ্লেষণ কিছু অধিক লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুকে আসন্ন মনে করার এ একরূপ প্রতিক্রিয়া। জীবন থেকে চলে যাবার আহ্বান যখন এল, তখন হিসাব-নিকাশ করতে বসা স্বাভাবিক, এবং পুরানো স্মৃতির শেষ রোমন্থনও অস্বাভাবিক নয়। কবি চলে যেতে যেতে আপনার ভালবাসাকে এই পৃথিবীর পথে-ঘাটে রোপন করে যেতে চাইছেন—

হয়তো আমার এ-পথে আর হবে নাকো আসা,
দু'ধারে যাই রোপন ক'রে বুকের ভালবাসা।
ধুলার এ-পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমর ক'রে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাঁদাহাসা।—(হয়তো)

কবি জানেন এ পৃথিবীতে দুদিনের "চড়ুই ভাতি"। এ জগতে অস্তিত্ব ক্ষণিকের, ক্ষণিকের হাসিকান্না, প্রীতির আনন্দ এবং বিরহের বেদনা। কবি যেমন আসন্ন মৃত্যুকে ভয় পান না, তেমনি দুদিনের চড়ুই ভাতির লোভটুকুকে তুচ্ছ বলে ত্যাগ করতে রাজী হন না। যখন মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসে জীবনের উপরে, যখন তাঁর বুলবুলি-মন ধুলো ঝেড়ে পাখা গুছিয়ে নীড়ের দিকে ফিরে তাকায়, নির্ভয়ে যাত্রা

করতে চায় অনন্ত রাত্রির দিকে, জীবনের সূর্য নেভায় ভয় পায় না, বলে—

ভয় কিছু নাই ডুবুক রবি, সম্মুখে পূর্ণিমার রাতি।

তখন কি প্রশান্তিতে কবিপ্রাণ অনুভব করে এ গতি উৎসের দিকে !—

কায়া থেকে আমরা এখন—ছায়ার দিকে যাচ্ছি ফিরে,
কথার মানুষ উপকথায়, ক্ষীরের পুতুল মিশব নীরে।
ফুল থেকে যাই সৌরভেতে
বিন্দু ব্যথা নাইকো এতে,
জীবন করি সঙ্গীতে শেষ—মরাল কুলের আমরা জ্ঞাতি॥

রূপবোধে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে কবির বেদনাহীন আত্মসমর্পণ —মৃত্যুর কাছে—সত্যের কাছে। কিন্তু কি ভালবাসা ছেড়ে যাওয়া জীবনের প্রতি ! বিদায়ের মুখে মানবপ্রাণকে ধরে রাখতে না পারায় পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, তার ক্ষণিকতার জন্য নেই কোন দার্শনিক ভৎর্সনা। গানের উপহারে শেষ বিদায় বাণী তিনি উচ্চারণ করেন। কারণ তাঁর—

ভাঙ্গা বুকের ফাটলেতে উঁকি মারে যূথী জাতী।

এবং এই যূথা জাতীর বীজ পৃথিবীর মধ্য থেকেই সংকলিত।

"রোগশয্যায়" নামাঙ্কিত কবিতাটির মধ্যে মৃত্যুবোধ যে প্রবলভাবে দেখা দেবে তা খুবই স্বাভাবিক। কুমুদরঞ্জনের এ কবিতায় মৃত্যুবোধ আছে, তবে রোগযন্ত্রণার প্রকাশে এর কল্পনা কোথাও জটিল এবং বিকৃত হয়ে ওঠেনি ; বরং এ কবিতার ছন্দ-স্পন্দনে একটি চাঞ্চল্যের সুর ধরা পড়ে। এ কবিতায় কবি নতুন শৈশবের প্রাণময়তাকে কামনা করেছেন। বার্ধক্য-জীর্ণ জীবনটিকে পরিত্যাগ করে নতুন জীবনে, নতুন শৈশবে জেগে ওঠার একটি সুকোমল ইচ্ছা রূপ-সৌকুমার্যে প্রকাশ পেয়েছে—

ঝঞ্ঝাহত ভগ্নতরু চায় যে যেতে জাফ্‌রীতে,
শিথিল ফুলের কোরক হবার আকাঙ্ক্ষা সব পাঁপড়িতে।
মুক্তা যে আর বারে বারে
তারের বাঁধন সইতে নারে,
সে চায় যেতে শুক্তি-কোলে সাগরতলে ঝাঁপ দিতে।

জীবনকে ভোগ করতে চান তিনি, এক জনমে তৃপ্তি পান না, জন্মান্তরে বার বার ফিরে আসতে চান, এক দেহে স্বাদ মেটে না, নতুন দেহে নতুন ভাবে আস্বাদ পেতে চান ; আর সে-ভোগ অনাসক্তের ভোগ বলেই মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না।

॥ নবম অধ্যায় ॥

রূপরীতি

Though the poet's own practice so often refuted them, critics of the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries were apt to talk of imagery or ornament, mere decoration, like cherries tastefully arranged on a cake. The idea that imagery is at the core of the poem, that a poem may itself be an image composed of multiple of images, did not begin to have any official currency till the Romantic movement.

—C. *Day Lewis : The Poetic Image.*

॥ এক ॥

কুমুদরঞ্জনের কবিতার রূপরচনা-রীতিতে অভিনবত্ব নেই, অন্য পাঁচজন কবি থেকে তা আপনার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে পারে না। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের ভাষায় 'ষ্টাইল বলিতে ভাষা বা শব্দযোজনা-রীতির যে মৌলিকতা বুঝায় তাহা কুমুদরঞ্জনের কবিতায় কোথাও নাই··· ; তাঁহার ভাষায় যে চমৎকারিত্ব তাহা উপমাগুলিরই ভাব-অর্থগত ; তাহাতে যে চমক আছে তাহা প্রধানতঃ ভাবেরই চমক, তাঁহার ভাষায় যে একটা নিরাবরণ নগ্নতা তাহা প্রায় গদ্যের মত ; এ বিষয়ে কবি বিহারীলালের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তথাপি বিহারীলালের ভাবাবেগ সরল হইলেও ভাববস্তু সরল নয় ; ভাবের অনুভূতি অতিশয় ব্যক্তিগত বলিয়া তাঁহার সেই সরল ভাষাকেও যথোচিত ব্যক্তিগত করিয়া লইতে হইয়াছে, এ জন্য বিহারীলালের

শব্দযোজনায় একটা ষ্টাইল আছে। কুমুদরঞ্জনের সেই সরলতাই আছে, ষ্টাইল নাই ; তার কারণ তাঁহার অনুভূতির ব্যক্তিত্ব থাকিলেও ভাবগুলি বিশেষ নয়, সাধারণ।” (—সাহিত্য-বিতান)। খুব বড় কবিদের কথা ছেড়ে দিয়েও উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার কিছু অংশ পাঠ করলে প্রায়ই ছন্দ, শব্দচয়ন ও চিত্রকল্পগত এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যে বিষয়বস্তুর প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা না জেনেও কবির নামে সেই রচনাকে চিহ্নিত করা যায়। কুমুদরঞ্জনে সে-জাতীয় বিশিষ্টতা বড় চোখে পড়ে না। মোহিতলাল ষ্টাইল বলতে রূপরীতিগত এই ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য তথা কবিআত্মার প্রতিফলনের কথাই বুঝিয়েছেন। জীবন-জিজ্ঞাসা, রূপচেতনা ও ব্যক্তি-আত্মার সচেতন ও তীব্র উপলব্ধির যে ঘনিষ্ঠ সংহতির ফলে ষ্টাইলের জন্ম হয় কুমুদরঞ্জনে তার অভাব ছিল।

তবে কবিতার দেহগঠন, স্তবকনির্মাণ, ভাষাচয়ন, চিত্রকল্প সৃষ্টিতে কুমুদরঞ্জনের কিছু প্রবণতা খুঁজে বার করা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য অপরের সঙ্গে এমন পার্থক্য সূচিত করে না যে তা দেখেই কবিকে চিনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এগুলিকে আমি প্রবণতামাত্র বলেছি, ষ্টাইলের সিদ্ধিতে এই প্রবণতাগুলি আমাদের নিয়ে যায় না, এবং কেন নিয়ে যায় না তার কারণটি বোঝাবার চেষ্টা পূর্বেই করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সেই প্রবণতাগুলি বুঝে নেব।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রবণতাই শুধু নয়। কুমুদরঞ্জনের কবি-পরিচয় কেবলমাত্র তাঁর স্বাতন্ত্র্যের উপরেই নির্ভর করে না। অনুভূতি-কল্পনা ও রূপরচনা উভয় দিক থেকেই তাঁর অনেক রচনা সাধারণের মনের নিকটবর্তী। রূপধৃত হয়ে তাদের মধ্যে কতটা সার্থকতা এসেছে এ প্রসঙ্গে সে বিচার করা কর্তব্য। এই বিচারের সাহায্যে একদিকে

তাঁর কবিতার কেবল কবিতা হিসেবে উৎকর্ষের পরিমাপ করা যাবে। কারণ "আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক না, অপরের কাছে তার যা-কিছু মূল্য, সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না।"—(প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম)। কুমুদরঞ্জনের জীবনবোধ ব্যাখ্যার সময়ে এ সম্পর্কে প্রসঙ্গত নানা মন্তব্য করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গের আবার অবতারণা করা হবে কবির রচনার প্রতি একটি সামগ্রীক দৃষ্টি রেখে। এই জাতীয় বিচারের দ্বিতীয় তাৎপর্য হল কবির জীবনবোধের সত্যকার পরিচয় লাভের দিক থেকে। কবি সামাজিক মানুষও। আপনার অন্তরের কাব্যাদর্শের প্রতি অতন্দ্র আনুগত্য সর্বদা বজায় রাখা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, আবার বহুক্ষেত্রে আপনার কবিঅন্তরের সত্য পরিচয়ও তিনি জানতে পারেন না। তাই দিগভ্রান্তি ঘটে। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর অনুসরণে কবির কবিপ্রাণের পরিচয় নিতে গেলে ঠকতে হতে পারে। রূপরীতির সার্থকতার পথ ধরলে কোন জাতীয় বিষয়বস্তুর প্রতি রচয়িতার কবি-চিত্তের আসক্তি তা আবিষ্কার করা সহজ হয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

কুমুদরঞ্জন মহান ও গৌরবময় বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু কবিতা লিখেছেন। রাজনীতি-সমাজনীতির ঘটনা-বহুল তরঙ্গিত ভাব-ভাবনা, ইতিহাসের কথা, পৌরাণিক ঘটনার ঘনঘটা তাঁর কবিতায় স্থান পায় নি এমন নয়। এই জাতীয় কবিতা সব মিলে সংখ্যার দিক থেকেও খুব ন্যূন নয়। অথচ কবির প্রাণকেন্দ্রের পরিচয় নিতে গিয়ে এদের সাক্ষ্যকে আমি

অগ্রাহ্য করেছি। তার কারণ প্রধানত মিলবে রূপসৌকর্যের বিচারে। এ-জাতীয় কবিতায় যে ভাব-গাম্ভীর্য প্রকাশিত হওয়া উচিত কবির শব্দচিত্রে তা প্রায়ই ধরা পড়ে নি। ইতিহাসরসের সচল সমগ্রতা, পুরাণের বর্ণাঢ্যতা কুমুদরঞ্জন সাধারণত আয়ত্ত করতে পারেন নি। দু' চারটি ক্ষেত্রে যে কিছু সার্থকতা আছে তা মেনে নিয়েও এই সাধারণ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার আমি পক্ষপাতী। কবি প্রায়ই তথ্যচয়নে, পুরাণঘটনার উল্লেখে, ইতিহাসের প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করে কার্য সমাধা করতে চেয়েছেন। অনেক সময়ে বিবৃতিধর্মে তাঁর চিত্ররচনার সাধনা আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে মনে হয় কবির প্রাণ-কেন্দ্র এ-জাতীয় বিষয়বস্তুতে উদ্বুদ্ধ হয় নি। তাঁর জীবনবোধের সন্ধানে অন্যদিকে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে সোমনাথ বিষয়ক কবিতাগুলির কথা। বিরাট-বিপুলের অভ্রভেদী মর্যাদা রূপনির্মাণে পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে কি? কবির সচেতন চিত্ত-প্রবণতা এ কবিতাগুলির জন্ম দিয়েছে। কবি বারবার বলেছেন "বিরাট দেউল শোভে ত্রয়োদশতল", "সুবর্ণে গড়া দুইশত মণ ভারী", "তীর্থযাত্রী হেরে বিস্ময়ে উর্দ্ধে নেত্র তুলি", "পুণ্যে বিশাল ধর্মায়তন", "বিরাট তোরণদ্বার সুবিশাল সুন্দর কপাট",—

কি বর্ণনা দিয়ে যাব—আসে মনে দ্বিধা ও সংশয়
দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উচ্চতায় দেব কি ইহার পরিচয়।

কবি মানস-নেত্রে প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের ঐশ্বর্য দর্শন করে যে-বিস্ময় অনুভব করেছেন· তার সংবাদ এই পংক্তিগুলিতে আছে। কবি তাকে বিরাট বিপুল, সুবিশাল প্রভৃতি নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন, দুইশত মণের সংখ্যাতত্ত্বও পেশ করেছেন, কিন্তু পাঠকের মনে বিরাট বিপুলের ধারণা জাগাতে পারেন নি। কবি যে বিস্মিত হয়েছিলেন তার খবর

মিললেও পাঠকদের বিস্ময়রস এই কবিতাপাঠে জাগরিত হবার নয় রূপরচনায় এখানেই ব্যর্থতা। প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, "কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদব হিসেবে দেখেন, তা হলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়; এবং যে মুহূর্ত থেকে কবির নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন।"—(প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম)। নীলাকাশভেদী মন্দিরের চূড়াগুলিকে কবি বলেছেন "স্বর্গসরণি দেখাইছে যেন বিধাতার অঙ্গুলি।" এই বাক্যাংশে একটা গম্ভীর ভাবদ্যোতনা চিত্ররূপের নৈকট্য পেয়েছিল কিন্তু "বিধাতা" শব্দটির ব্যবহারে তা বিনষ্ট হয়েছে। এই শব্দটি কোন চিত্ররূপ বয়ে আনে না পাঠকের সামনে। যদি রুদ্র কিংবা ত্র্যম্বক বা যে-কোন শব্দ যা রূপের ইঙ্গিতবাহী, এখানে ব্যবহৃত হত পংক্তিটির কাব্যমর্যাদা স্বীকার্য হত। যেমন নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে শব্দচয়নের সচেতন সতর্কতা চিত্ররূপকে ভাববাহী করে তুলেছে। কবি যখন বলেন—

ত্র্যম্বক্ তব অট্টহাসের ধ্বনি কানে এসে লাগে।

তখন 'ত্র্যম্বক' এবং 'অট্টহাসে'র ধ্বনিগাম্ভীর্য চিত্রকল্পে মহিমার দ্যোতনা আনে সহজেই। আবার—

কাল মেঘে উড়ে তব জটাজাল ভারত আকাশ ঘেরি,
তব ত্রিশূলের জ্যোতিঃ বিদ্যুৎ চমকে—চমকি হেরি।

প্রভৃতি পংক্তিতে :কবির চমকে ওঠার ভাবটি চিত্ররূপে বিদ্ধ হওয়ায় কবির ব্যক্তি অনুভূতির অংশ মাত্র না হয়ে পাঠকের চিত্তে বিস্ময়-চমক

জাগিয়ে তোলে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় এরূপ চিত্রগাম্ভীর্যের সার্থক নির্মিতি কমই ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

ইতিহাস ও পুরাণের ঘটনা এবং চরিত্রের অজস্র উল্লেখ কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ছড়ান। এই উল্লেখ যদি তথ্যভার মাত্র না হয়ে রসের আস্বাদ জাগাতে সমর্থ হয় তবেই এদের সার্থকতা। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বহুস্থানে তথ্যের উল্লেখে তালিকা রচনার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। আবার প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় তথ্যজ্ঞানের স্পষ্টতা ও গভীরতা কবিপ্রাণের বিশেষ বক্র দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ ধরনের রম্য-আস্বাদ জাগিয়েছে। কুমুদরঞ্জনও যখন ইতিহাস-পুরাণের পাত্রপাত্রীকে ঘরের ছেলেমেয়েতে রূপান্তরিত করেছেন তখন তাদের রূপ একটা শান্ত কোমল আস্বাদ যুগিয়েছে। অবশ্য সে ভীমার্জুনকে আর পৌরাণিক চরিত্র বলে তখন চেনা যাবে না। কিন্তু অন্যত্র তাঁর তথ্যচয়ন প্রাণরসের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নি। সে শুষ্ক তথ্যচয়নে কারও জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটলেও ঘটতে পারে, রসতৃষ্ণা নিবারিত হয় না। যেমন—

ঝঞ্ঝায় আমি শুনি, হই অস্থির,
ভাঙ্গার শব্দ সোমনাথ-মন্দির,
চিতোরী জহর-ব্রতের গন্ধ পাই,
উড়ে ঝঞ্ঝার দগ্ধ পুঁথির ছাই,
ভস্মীভূত সে পুস্তকাগার আলেকজান্দ্রিয়ার।

অথবা—

বহিতেছে স্রোত যুগের যুগের কর্ম্মধারার মতো,
তার সৃষ্টির তার কৃষ্টির ভঙ্গিমা হেরি কত।
কি প্রচণ্ডতা! মিলেছে কতই শক্তি অলৌকিক—
কতই আর্য্য কত অনার্য্য গথিক টিউটনিক!

কত পিরামিড, কতই স্ফিনিকস্ ভাঙ্গে গড়ে বার বার
ক্ষণে উত্থান ক্ষণেই পতন লক্ষ হারপ্পার।
হয়তো এতেই 'নোয়া'র আর্কের পেতে পারি সন্ধান।
বটপল্লবে এতেই কোথাও ভেসেছেন ভগবান।

জীবনানন্দের 'বিদিশার নিশা' বা 'শ্রাবস্তীর কারুকার্যে'র সঙ্গে এদের তুলনা করে লাভ নেই। কারণ সেখানে এই নামের ইঙ্গিত স্বপ্নময় অতীত কল্পনায় পাঠককে পৌঁছে দেয়, কিন্তু এখানে তথ্য আমাদের ভূগোল-ইতিহাসের জ্ঞানের রাজ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখে।

মাঝে মাঝে রূপহীন বক্তব্য ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতার মত মনে হয়—

কাহার এমন ইচ্ছা মৃত্যু, কে আছে এমন ত্যাগী,
কোথায় এমন কুবের ভিখারী, সদা হরি অনুরাগী।
হৃদয় কাহার স্বভাব শীতল, পদে পদে করে ক্ষমা,
নিমেষে আতুর মৃতেরে জীয়ায় বাণী কার সুধাসমা।
ধরণী কাহার চরণে লুটায়, সে তারে ঘৃণায় ছাড়ে
সে যে ভারতের ব্রাহ্মণ ওগো ব্রাহ্মণই শুধু পারে।

ব্রাহ্মণের প্রতি কবির শ্রদ্ধা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাঠকচিত্তে এর কিছুমাত্র রসাবেদন নেই, কারণ রূপসিদ্ধিই রসসৃষ্টির একমাত্র কাব্যিক পদ্ধতি।

॥ **তিন** ॥

শ্রীকালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের রূপসৃষ্টির সচেতনতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "আবেগের তাড়নায় যাহা কলমে আসিল তাহাই থাকিয়া গেল, দ্বিতীয়বার সংস্কার বা মাজাঘষা একেবারেই করেন না।" (কুমুদ-রঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচায়িকা) কবিতা সৃষ্টির দিক থেকে এ-জাতীয়

অভ্যাস খুব প্রশংসার যোগ্য নয়। কারণ "যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সংগীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে না তুলতে পারলে তা মূর্তিধারণ করে না, আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দজ্ঞান থাকা চাই ; কেননা সাধনা ব্যতীত কোনো আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না।—(প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম)।

কুমুদরঞ্জন কবিতার রূপনির্মিতির দিকে অতিসচেতন নন একথা ঠিক। তাঁর কবিতায় রূপের স্খলন ঘটেছে বারবার—একথাও সত্য। তবুও রচনার রূপরীতির দিকে তাঁর কোন নজর ছিল না, কাব্যদেহে পারিপাট্য আনার কোনরূপ চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কবিতার দেহগঠনে কুমুদরঞ্জনের যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রবণতা ছিল, একটু সতর্ক পাঠকের তা দৃষ্টি এড়াবার নয়।

"বনতুলসী" বা "শতদলে"র মত কাব্যে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির যে-কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন তার দেহরূপটি কবির নিজের আবিষ্কার নয়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নীতিমূলক ক্ষুদ্র কবিতার আঙ্গিকটি এখানে অনুসৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ "কণিকা"য় এই আঙ্গিকে মানব-চরিত্রের বিচিত্র দিকের কৌতুক কথায় মেতে উঠেছিলেন। কুমুদ-রঞ্জনের এই কাব্যকণিকাগুলির সুর তুলনামূলকভাবে অনেক গম্ভীর। কবির এ-জাতীয় আঙ্গিকের দিকে আকৃষ্ট হবার পেছনে কেবল রূপকর্মের কৌতুকই নয়, কিছু গভীর কারণ আছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতার দেহ

সাধারণত দীর্ঘ-বিস্তৃত নয়। ক্ষুদ্রাকৃতির দিকে তাঁর ঝোঁকটি স্পষ্ট এবং কবির বিশেষ মানস-দৃষ্টিতেই এর জন্ম মনে হয়। প্রসঙ্গত প্রমথ চৌধুরীর কাব্যচর্চার কথা মনে পড়ে। ত্রিপদী, চৌপদী বা সনেটের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে তিনি বড় এগুতে চান নি। কুমুদরঞ্জনের কবি-প্রতিভা সনেটের অনুকূল ছিল না। অথচ আট-বারো-কুড়ি পংক্তির ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতা তিনি অজস্র লিখেছেন যারা জাতি-ধর্মে আদৌ সনেটের নিকটবর্তী নয়। উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি ছেড়ে দিলেও এরূপ শতাধিক কবিতার নাম অনায়াসে বলা যায় যেখানে বিশ পংক্তি ছাপিযে কাব্যদেহ বিস্তার লাভ করে নি। কাজেই ক্ষুদ্রাকৃতির দিকে কবির একটি সহজ মানসিক প্রবণতার কথা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হয। দীর্ঘতর কবিতাগুলিও দু-তিন পৃষ্ঠার বেশি নয়। আকারের এই সংক্ষিপ্ততা ভাবরূপের কঠিন সংহতির ফল নয। সামান্য বস্তুর রূপে মুগ্ধ কবির চিত্ত মনের মত আধারই বেছে নিয়েছিল এই দেহভঙ্গিতে।

কুমুদরঞ্জনের সার্থক কবিতাগুলিতে ভাবের একটি বিন্দুমাত্র প্রকাশিত হয। সেই ভাবটির বিকাশ বড লক্ষ্য করা যায় না। কল্পনার দৈন্য এবং স্তিমিত আবেগ যেমন এর জন্য দাযী তেমনি এর ফলে কবি দীর্ঘকাল ধরে অতন্দ্র নিষ্ঠায় কাব্যদেহগঠনের দাযিত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সেরূপ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ কবির পক্ষে আদৌ সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

অনেকগুলি কবিতায় কবি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কাব্যদেহ গঠন করেছেন। বিশিষ্ট ভাববিন্দুটি কেন্দ্রে অবস্থান করে কিছু উপমাত্মক চিত্র আকর্ষণ করেছে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রে কবিতাটি গঠিত। যেমন একটি কবিতায় বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলে কল্পনা করে সংশয় প্রকাশ করেছেন কবি। এই সংশয় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্রে বদ্ধ হয়েছে—

সূর্যকরে কই সে মাজা স্বর্ণ কই ?
আম-মুকুলের কই সে পাগল গন্ধ রে ?
কই সমীরে নৃত্য-দোদুল ছন্দ রে ?
বুকের সুতায় নবীনতার মাঞ্জা কই ?...
বোধন-ঘটে বিসর্জ্জনের দাগ কেন ?
অরুণ আলোয় সাঁজের অনুরাগ কেন ?
নান্দীমুখে শুষ্ক কুসুম দূর্ব্বা যে—
ভোর ললিতে দূর বেহাগের সুর বাজে।

এ-জাতীয় খণ্ড খণ্ড উপমার ছবি অনেক সময়ে ভাববিন্দুটির অতি সন্নিহিত হওয়ায় পৃথক চিত্র হিসেবে বিকীর্ণ হয়ে কবিতার ঐক্যকে ব্যাহত করে নি। বহু ক্ষেত্রে এদের প্রাচুর্য স্বতন্ত্র চিত্ররসের আস্বাদকেই প্রধান করে তুলেছে, ভাববিন্দুটিকে অতি সহজেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপমাত্মক চিত্ররচনার কৌতুকই অনেক কবিতার মূল প্রেরণা, ভাবকেন্দ্রটির সূত্র অতি ক্ষীণ। উদাহরণ হিসেবে "একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি" কবিতার উল্লেখ করা চলে। ঊষর মাঠে একটি দ্রাক্ষালতা জন্মেছে। দেখে কবির মনে বিপরীতের সম্মিলন-জনিত এক বিস্ময়মিশ্রিত কৌতুকের ভাব জেগে উঠেছে। এই মনোভাবটি পৃথিবীর নিসর্গলোক, কাব্যলোক, সুরলোক থেকে বিচিত্র উপমার ছবি আকর্ষণ করেছে—

মশানে কে বসিয়ে দিলে নবৎ সুমধুর ?
মেঘনাদ-বধ কাব্যে দিলে কীর্ত্তনেরি সুর ?
মুক্তাপ্রসূ শুক্তি এনে ছাড়লে ডোবার জলে ?
আঘন মাসের নীহার কেন নিদাঘ চাঁপার দলে ?
চমরা গাই গোয়ালঘরে রইবে কেমন ক'রে ?
বল্‌গা হরিণ উটের গাড়ীর চাপেই যাবে ম'রে।

রজনীগন্ধা দিয়ে সূর্যের অর্ঘ্য নিবেদন, শেয়াকুলের গাছে জাফ্রান ফুল ফোটা, দিন দুপুরে আরব্য রজনীর গল্প জুড়ে দেওয়া প্রভৃতি আরও অনেক কথাই কবি বলেছেন। "রিকস", "বৃদ্ধ", "চৈত্রবৈশাখী" প্রভৃতি আরও অনেক কবিতায় এ ধরনের চিত্ররস-প্রীতির প্রমাণ দিয়েছেন কবি। এরা কবিতার মূল ভাবরসটিকে পাঠকমনে সঞ্চারিত করার দায়িত্বও গ্রহণ করে না।

আবার কিছু কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতায় কতকগুলি উপমা-চিত্রের পরিণতিতে একটি বিশেষ উপমা-চিত্রের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়। ফাটলের ফুলকে দেখে কবির চূড়ান্ত মন্তব্য হল "নূরজাহানের জন্ম এ যে ঊষর মরুর মধ্যে", জুঁই সম্বন্ধে "অনুরাগের পথের সাথী আমার রামী তুই", ভুঁইচাঁপার বর্ণনায় "তুলট পুঁথির মলাট ভেঙ্গে শকুন্তলা বেরিয়ে এল," সাঁওতাল যুবতী সম্পর্কে মন্তব্য,—

স্বাধীন-সরল, কঠিন কোমল গিরির মধুকরী
বিশ্বকবির কাব্য সজীব 'বাণের' 'কাদম্বরী'।

তৃণকুসুমকে "তুই যে কমল পারিজাতের ভাই" বলে উল্লেখ এই প্রবণতার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। কোথাও কোথাও কবির ভাবাবেগ এই চূড়ান্ত রূপচিত্রণে অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কোথাও আবার কবির ধর্মচেতনা বড় হয়ে উঠেছে, কোথাও এই চিত্র মূল ভাবরসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে পুরাণ-ইতিহাসের কথা উল্লেখমাত্র থাকে নি, উপমা হিসেবে আসে নি, তারা কবিতার মূলরসেরই ভাবরূপ হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ "কৃষ্ণারজনী" কবিতাটির সাক্ষ্য নেওয়া চলে। অন্ধকার রাতের সঙ্গে একটি বেদনা-করুণ সুরের দ্যোতনা যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। এই বেদনার ভাবটিই প্রকাশিত হয়েছে মৃত পতী কোলে

সাবিত্রীর একাকিনী নয়নজলে ভাসা, গাঙুড়ের নীরে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলার যাত্রা, বারানসীধামের শ্মশানে মৃত পুত্র-দেহের সম্মুখে হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার মিলন, বনমাঝে দময়ন্তীকে ফেলে রেখে নলরাজের পলায়ন—এই চারটি ঘটনা-চিত্রের মাধ্যমে। "অমর বিদায়", "দুঃখের রাজ্য" প্রভৃতি কবিতায়ও একই কাব্যদেহ-গঠনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যেও কাব্যসার্থকতা সর্বত্র লব্ধ নয়। কোথাও কোথাও যেমন "অমর বিদায়" কবিতায় রচনাভঙ্গিতে একটি পূর্ব পরিকল্পনার অনুসরণে স্বতঃস্ফূর্তির অভাব প্রকট।

কুমুদরঞ্জন আর এক ধরনের কবিতা রচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এগুলি অনেকটা গাথা জাতীয়। একটি গল্পের বা চরিত্রের সূত্রে কবির ভাব-দৃষ্টিটি এখানে প্রকাশিত। তবে রবীন্দ্রনাথের "কথা" কাব্যের সঙ্গে এদের এক গোত্রীয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। "কথা"র প্রধান অবলম্বন অতীতাশ্রয়ী ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক কাহিনী। নীতিশিক্ষা সেখানে অপ্রধান। গল্পরস সেখানে আস্বাদ্য। নাটকীয়তা দ্বারা গল্পরস দানা বেঁধেছে। চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে আদর্শ-মুখিতা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের বিচিত্রতায় মুগ্ধ হতে হয়। কুমুদরঞ্জনের কবিতাগুলিতে প্রধানত বর্তমান কাল এবং কবির অভিজ্ঞতার রাজ্যের পটভূমি গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণায়তন গল্প-কথন এ সব ক্ষেত্রে কবির উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। কবির বিশিষ্ট "আইডিয়াটি" গল্পরসকে প্রায়ই ছাপিয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলিও বিচিত্র মানবিক বৃত্তির জটিল সমন্বয় না হয়ে কোথাও ঐকান্তিক ভক্তিরস, কোথাও কোন সৎ গুণের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এরূপ অজস্র গল্পমূল কবিতা কবি লিখেছেন। পূর্বে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে। আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করবার জন্য এখানে আর দু'একটির প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে।

"শ্রীদাম" কবিতায় কবি তাঁদের গ্রামের বৈষ্ণব বাবাজীর কাহিনী বলেছেন। খ্যাপাটে ধরনের সেই বাবাজীর মধ্যে কি গভীর ধর্মপ্রাণতা ছিল তার প্রমাণ মিলল একদিন ষ্টিমারে যেতে যেতে। তাঁর হরিনামের ঝুলি হঠাৎ গঙ্গায় পড়ে যাওয়ায় বাবাজা ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রাণ হারালেন। ঘটনার অভাবে, বর্ণনার দৈন্যে, চরিত্র-কল্পনায় পরিকল্পনার প্রাধান্য ঘটায় এ কবিতা ভক্তিমূলক বিবৃতির ঊধ্বর্স্তরে উঠতে পারে নি। অথবা গ্রামের অকেজো অলস ছেলে "খেতু" কি করে বন্যা-উচ্ছ্বসিত নদীর মধ্য থেকে শিশুদের নৌকাটি উদ্ধার করে নিজের প্রাণ দিয়েছিল তার বর্ণনায়ও প্রাণের উদ্বোধন ঘটে নি। "পর উপকারে বীতরাগ" এই যুবকের মনোজগতের পরিবর্তনের আকস্মিকতাকে নাট্যরসে সিঞ্চিত করে ধরে রাখলে যা আস্বাদ্য হতে পারত, তরঙ্গহীন বিবৃতিতে তা হয়ে পড়েছে আবেদনহীন।

॥ চার ॥

কুমুদরঞ্জনের শব্দ, ছন্দ ও চিত্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ কম। এ বিষয়ে কবির অনন্যতা স্পষ্ট নয়।

শব্দ চয়ন ও বয়নের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণত প্রথানুগ এবং চারপাশের মিত্র-কবিকুল থেকে পৃথক নন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা-বিচারে তাঁর শব্দ-প্রীতি যেমন বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে তেমন নয়। শব্দ ব্যবহারে তাঁর স্বতঃস্ফূর্তি মেনে নিতে হয়। শব্দের ধ্বনির দিকটিকে তিনি খুব কাজে লাগাতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না। গাম্ভীর্যপূর্ণ সমুন্নত রূপচিত্র ও জীবনবোধের প্রতি কাব্যিক আস্থা না থাকায় শব্দ-ধ্বনিকে সেদিক দিয়ে প্রযুক্ত করার বড় প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। করলে সম্ভবত কিছু অধিক রূপসার্থকতা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেত। "বাজে ডম্বরু, ভুজগ গরজে",

"জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ", "সপ্তসিন্ধু সবলে আলোড়ি", "অস্থিমালার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রণিত ঝণৎকার"—এইরূপ ধ্বনিগম্ভীর শব্দের প্রয়োগ ক্বচিৎ আছে। তবে সাধারণভাবে তৎসম শব্দের প্রতি কবির কোন বিদ্বেষ নেই। তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহারই তাঁর কবিতায় অধিক। প্রসঙ্গক্রমে 'উল্লেখ' হিসেবেই কিছু বিদেশী শব্দ এসেছে। একান্ত দেশী শব্দের দিকে খুব কিছু আকর্ষণ চোখে পড়ে না। শব্দের ধ্বনিস্থষ্টির দিক থেকে মধুর মৃদুতা বা কোমল হিল্লোলের ভাব জাগিয়ে তোলায় কবির সচেতন প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও সফল হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন "অলির নিমন্ত্রণে" মৌমাছিদের গুঞ্জনটি যেন সাবলীলভাবেই শব্দচয়নে ধ্বনিত হয়েছে—

আয় রে মধুর গুনগুনিয়া
সারঙ-সুরের জাল বুনিয়া।

আবার "বেরুলি" কবিতায় দীঘির কালো জলের তরঙ্গ হিল্লোলটি ধরা পড়েছে—

নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল,
তরুর ছায়াগুলি ভাঙ্গিয়ে অবিরল।
লহরী সনে ঢলি
পড়িছে 'কাঁসাতলি'
সরমে মুখ চাপি হাসিছে শতদল,
নাচিছে তালে তালে গভীর কালোজল।

প্রথম উদাহরণে নাসিক্যধ্বনি গুঞ্জরনকে যেমন প্রকাশ করেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ল' ধ্বনির প্রাচুর্য কোমলতা ও হিল্লোলকে ব্যঞ্জিত করেছে। অবশ্য ছন্দভঙ্গি শব্দের ধ্বনি-বিশিষ্টতাকে বিশেষভাবেই সাহায্য করেছে।

তবে শব্দের আবেদন কেবল কানের কাছে নয়, অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও সে বঞ্চিত করে না। শব্দ চিত্র নিয়ে আসে। তাতে কেবল রেখা আর রঙ্ই থাকে না। গন্ধ, স্পর্শও অনুভব করা যায়। যে অর্থে কীটস ইন্দ্রিয়ানুগ কুমুদরঞ্জনের কবিতা সে অর্থে ইন্দ্রিয়ানুগ নয়। তবে রঙের এবং স্পর্শের কিছু আবেদন তাঁর কবিতার শব্দ-চিত্রে মিলবে। কুমুদ-রঞ্জনের চিত্রকল্পে রেখার স্পষ্টতা বড় নেই, রঙের শোভাই অধিক। "ডুব্তো রবি আকাশ গাঙে সিঁদুর রাঙা শোভার বানে", "আকাশ ঘিরে এ জাল ফেলা—সারা গগন জলদজলে ভর্তি গো," "তারা গুঁড়া দিয়া গড়া ছায়াপথ," "তোমার দুকুল হইবে শ্যামল পুনঃ হেমন্ত শীতে, সজ্জিত হবে বেগুণী হরিৎ লাল নীল শ্বেত পীতে।" "স্বচ্ছ সলিল দ্রব হীরকের হার···," "তার গৈরিকে রাঙায় আমার বাস",

জগৎ-জননী মা না হ'তো যদি দোপাটি পেত কি ফোঁটা ?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী আর কদলী গরদ গোটা ?
ময়ূর পেত কি ময়ূরকণ্ঠী রেশমী পোশাক টিয়া ?
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি বাঁধা লাল ফিতা দিয়া ?···
সাম্‌নেই দেখ দুষ্টু বোলতা সোনালী ঘুন্সী-পরা।
বকের কামিজ কিবা ইস্তিরি' যায় না ময়লা করা।
ডোবার যে পানা—তাহারও পোশাক তাহাতেও ফুল-কাটা ;
ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই ওই যে খেজুর-কাঁটা।

"ফড়িঙের ফিনফিনে গায় নানান্ রঙের কি আমদানী", "ডিমে ঐ প্রজা-পতির পান্না মণির কি মাধুরী", "রঙটি ছিল গৈরিক এবং খৈরী"—এরূপ আরও অজস্র উদাহরণ সংকলন করা চলে। এ ছাড়া আছে সবুজের বিপুল আয়োজন। বাংলা দেশের বুকের প্রধান রঙ সবুজ। কুমুদরঞ্জনের চিত্রকল্পেরও। সবুজে ও গৈরিকে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয় নি তাঁর কবিতায়, কবির জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতার জন্য আর রাঢ়ের গেরুয়া মাটি,

সবুজ পাতা-পল্লবের সমারোহের সহজ সম্মিলনের জন্য। এই বর্ণসজ্জার মহোৎসবেও কিন্তু কবির রচনায় রঙ্ কোথাও চড়ে নি। লাল রঙে কামনার প্রগলভতা, সোনালীতে যৌবনের মাদকতা, নীলে অসীমের আকুতি বড় জাগে নি। সবুজের মৃদুতা যে কোন রঙের পশ্চাতের সুরটি বেঁধে রেখেছে আর গৈরিকের আসক্তিহীনতা। কুমুদরঞ্জনের শব্দচিত্রে একটি বিশিষ্ট স্পর্শগুণ আছে। তা হল কোমলতা-পেলবতার। কবির মনোরাজ্যের সঙ্গে এর স্বাভাবিক সম্পর্ক। তাঁর কবিতায়—

অশনি কুসুম হয়, পাষাণ গলে,
মরুরে ভাসায়ে দেয় জোয়ার-জলে,

এবং "ছেনীর আঘাতে পুষ্পিত হয় শিলা"। কবি বলেন—

কি যেন এ পথের ধূলি,
করলে নরম সোহাগগুলি'
সূর্যকরে পাই যেন তার করের পরশন।

কোমলের সঙ্গে সবুজের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, কিন্তু গৈরিকের? এখানেই কবির বৈষ্ণব ধর্মসংস্কার জয়ী হয়েছে। কবি ভোগাতীত ত্যাগ—গৈরিককে এবং মধুরের সাধনাকে এমনি করেই মিলিয়েছেন।

ভাবের মত কবির রূপচিত্রাঙ্কন স্পষ্ট উপলব্ধিগম্য ব্যাপার। তাঁর চিত্র ও ভাব পরিবেশগুলি একান্তই পরিচিত। পরিচিত চিত্ররস আস্বাদের মধ্যে প্রায়ই এরা পাঠকমনকে ডুবিয়ে দেয়। একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ করা হল—

তার সে ছোট কুটিরখানি অজয় নদীর পারে
ছোট ছোট শিশুর গাছ জাগছে চারিধারে।
বসলে আঙিনায়
ক্ষেতটি দেখা যায়
ছুটে ছুটে ভেড়ার পাল আসে তাহার দ্বারে।

তরুলতার রাঙা ফুলে চালটি আছে ঢেকে
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটি গায়ে মেখে।
নদীর কালো জল
করলে টলমল
হাঁসগুলি তার হেলে দুলে ডাঙায় আসে বেঁকে।
দোপাটি ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার
আটটি জনের বেশী কভু নেয় না সে তো ভার ॥
ঝিঙে কচু পুঁই
ভাবে কোথা থুই
হাটের লোকে আঁজুল আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।

লক্ষণীয় ঝিঙে-কচু-পুঁই থেকে শুরু করে ভেড়ার পালের ছুটে আসা পর্যন্ত সহজভাবেই কবিবর্ণিত চিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। না-বলা বাণীর গুঞ্জরন তাঁর কবিতায় বড় পাওয়া যাবে না। তাঁর শব্দচিত্র ভাবটিকে সাধারণত সম্পূর্ণই প্রকাশ করে ; এবং তার আবেদন আমাদের দেখা ও ছোঁয়ার ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করেই। তবে কিছু কিছু চিত্রকল্প ভাবগর্ভ। কেবল ইন্দ্রিয়গম্য চিত্রহিসেবে তাই তারা অনেকখানি অস্পষ্ট। ভাবানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতই তাদের স্পষ্ট করে তুলতে পারে। কবির পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা, সহজভাবে মৃত্যুকে বরণ করার মধ্যেও প্রকাশ করেছেন এই ছবিতে—"জীবন করি সঙ্গীতে শেষ—মরাল কুলের আমরা জ্ঞাতি"। দীর্ঘ-গ্রীবা রাজহংসের শুভ্র কান্তি ও সঙ্গীতের মধ্যে জীবনসমাপ্তি কবি-আত্মার এক বিশিষ্ট পরিচয়ই বহন করে না, এক পবিত্র সৌন্দর্যাকৃতিপূর্ণ রূপ যেন তুলে ধরে মনশ্চক্ষুর সামনে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কবি বলেছেন—"দুধারে যাই রোপন করে বুকের ভালবাসা"। কবির ভালবাসার বিরাট বৃক্ষ-সম্ভাবনা এর মধ্য দিয়ে যেমন রূপ পেয়েছে, তেমনি কবির ব্যক্তিত্বের বৃক্ষ-শ্যামল

কোমল কান্তির রূপাভাস বহন করে আনছে। "গভীর স্নেহের নোঙর ফেলা" বনের ঝোপ-ঝাড় ভুলে কপোতদের "ক্ষণিক মুখর করলে বুকের খোপগুলি" কবিচিত্তের গভীর মর্ত-প্রীতির ভাবগর্ভ চিত্র হিসেবে সার্থক। পুরীর মন্দিরে দেবতার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ ও অতৃপ্ত কবি বলেছেন, "রাখিয়া গেলাম, আঁখির পিয়াসা আরতির দীপে তুলি"। এই চিত্রে যেমন কবির ভক্তিপ্রাণতা ও রূপতৃষ্ণা যুগপৎ মূর্তি ধারণ করেছে তেমনি আবার পৃথিবীর রূপের পাত্রেই চিরন্তনের অমৃত তিনি পান করতে চান এই ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে একটি অপূর্ব ভাবগর্ভ চিত্রে "না জানিয়া পান-পাত্র কেমনে পান করি মকরন্দ"। তবে এ-জাতীয় ভাবগর্ভ চিত্রকল্প কুমুদরঞ্জনের কবিতায় অধিক নেই। সেখানেই কুমুদরঞ্জনের সৃষ্টি-ক্ষমতার সীমা।

শব্দচয়ন এবং চিত্ররচনার বিশিষ্টতায় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বা অনুভূতিকে রূপায়িত করবার অসামর্থ্য কবি সম্ভবত কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে সাফল্যলাভে কবির চেষ্টার অন্ত ছিল না। কখনও কখনও পুরাণাশ্রিত বিদেশী শব্দকে উল্লেখ (allusion) হিসেবে ব্যবহার করে সমস্যাপূরণ করতে চেয়েছেন—

চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়,
সুবর্ণ পরশ ঊর্ধ্বে জেসন কি করেছে সঞ্চয়?
সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব সুধাস্যন্দী গম্ভীর মহান,
পাষাণ ভিতরে যেন অর্ফিউস গাহিতেছে গান।
অনন্ত অম্বরে উঠি স্বর্গ মর্ত্য করে সমন্বয়।

কিংবা,

সুঠাম পেশল দৌবারিক,
যেন শত হার্কুলিস দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্ণিমিখ।

সম্ভবত মেগাস্থিনিসের দৃষ্টিতে সোমনাথ মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে গ্রীকনামের এত ছড়াছড়ি ঘটিয়েছেন কবি। কিন্তু ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব বা ঘটনার উল্লেখে ভাবগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা কবির বহু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। দেশী ও বিদেশী দু'রকমের উল্লেখই আছে। কিন্তু কোথাও কবি স্বচ্ছন্দ নন। এগুলি শব্দমাত্র থেকে গিয়েছে, কোথাও কদাচিৎ বিচ্ছিন্ন ছবির আমেজ এসেছে, কিন্তু সব মিলে বিশেষ ভাবরস ফোটাতে তারা সক্ষম হয় নি। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কথা স্বভাবতই মনে আসে। তাঁর কবিতায়ও উল্লেখের ছড়াছড়ি। ইতিহাস-পুরাণ-ভূগোলের বিচিত্রকথার দীর্ঘ তালিকায় তাঁর বহু কবিতার কাব্যরস আবৃত। কিন্তু, কবির সাবলীলতায় কোথাও বাধা ঘটে নি। অনায়াসে এদের আমদানি সত্যেন্দ্রনাথের অধ্যয়নের প্রাচুর্যের প্রমাণ দেয়। এদিক দিয়ে কুমুদ-রঞ্জনের কবিতায় প্রবাসভ্রমণের অস্বস্তি এবং সিদ্ধিহীন সাধনা লক্ষণীয়।

অবশ্য কৌতুকের মধুর সুরে বাঁধা পড়ে দূর স্থান কাল কিংবা বিপুল বস্তুর উল্লেখও কখনো কখনো রসনির্মিতিতে অসার্থক হয় নি। যেমন—

ফায়ার ব্রিগেড ছোটে নাইকো গুজার,
এ যেন রে জেলে-ডিঙি, তাহারা ক্রুজার।

অথবা,

ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি,
গ্রাণ্ডিফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটী।

সাধারণত হীরাজহরতের ঐশ্বর্যদীপ্তি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ফোটে না, কিন্তু রঙিন পুঁতির পরিপ্রেক্ষিতে তার উল্লেখ লঘু সুরের উপভোগ্যতা নিয়ে আসে—

নয় হীরা জহরত, উঁচু নয় শির,
চমকি সে যেন ছোট রঙিন পুঁতির।

এই লঘু সরল সুরের তারে একান্ত লৌকিক বা দূর পরিবেশবহ শব্দও মাঝে মাঝে সফল হয়েছে। এদিক থেকে বিশেষ করে "গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড" কবিতাটির কথা মনে আসে; শব্দচেতনশিথিল কবির এই কবিতাটির মূল আস্বাদ শব্দ ব্যবহারের বিচিত্র সার্থক কৌশলেই। দুটি স্তবকের উদ্ধৃতি নিয়ে এর পরিচয় নেওয়া যাক—

কোথাও গো-গাড়ী আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে চলছে,
টোঙ্গা একা পাল্কি ছক্কা লক্কার মত টলছে।
ছুটেছে অশ্ব দুষ্ট,
উষ্ট্রের দল পুষ্ট,
কোথাও মোটর ভাপ্‌রা উগারি' দাপটে দুনিয়া দলছে।

আবার,

বহুভাষী তুমি কথা কও কভু হিন্দি উর্দ্দু বাঙ্‌লায়,
পুস্তুতে তুমি চোস্ত, দেখি যে, বল কে তোমারে সামলায়।
সুর যে তোমাকে হাতড়ায়
ঠুংরি কাজরী দাদরায়,
ঘটাও সখ্য খান্দানী সেখ, বাবু, শেঠ, লালা লাঙ্‌লায়।

লঘু কৌতুকের এই সরল সুরের পেছনে একটি প্রীতির গভীরতা আছে। সে প্রীতি জগৎ ও জীবনের প্রতি। এই সহজ প্রীতিরই অন্য নাম কবি কুমুদরঞ্জন। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বৈপরীত্য ধ্যানচিত্ত সাধকের চেতনায় দার্শনিক জিজ্ঞাসা জাগায়, নিরাসক্ত দৃষ্টির অধিকারী করে শিল্পীকে, কাউকে পলায়নের প্রেরণা দেয়, কাউকে করে সংগ্রামের পথে আহ্বান। কুমুদরঞ্জনের বহু কবিতায় বিপরীত চিত্র-রচনা প্রাধান্য পেয়েছে। চিত্ররচনার এই বৈপরীত্য কখনো কখনো এসেছে বিষয়ের দাবীতে; কিন্তু বিষয়কে ছাপিয়ে এই

বিপরীতের কৌতুক মিশ্রিত চিত্ররসই এখানে মুখ্য হয়েছে। তার পেছনে প্রীতির একটি অনুরণনও অবশ্য শ্রুতিগম্য। বহু কবিতায় রূপরচনা রীতিতে এই পদ্ধতিটি কবি অনুসরণ করেছেন।

যেমন—

কে বসালে উষর মাঠে এমন আঙুরলতা ?

—(একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি)

লক্ষ্মীজোলে পাকার পাশে নূতন রোয়া ভুঁই,
বন-ধুতুরার পাতার ফাঁকে আধফোটা এক জুঁই।

—(চৈত্র বৈশাখী)

শ্যামলের ভিটালোপ রজতের নিলামে।

—(বৃদ্ধ)

এরূপ অনেকগুলি কবিতা আদ্যন্তই বিপরীতের চিত্ররসে পূর্ণ তা ছাড়া আরও অজস্র কবিতার মধ্যে এখানে সেখানে এরূপ চিত্রনির্মিতির সন্ধান মিলবে।

কুমুদরঞ্জনের রূপরীতির কতকগুলি বিশেষ প্রবণতার পরিচয় দিয়ে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করা গেল। কবির সার্থকতা অবিমিশ্র নয় ঠিকই, কিন্তু রূপরচনা বিষয়ে কবি যে সর্বচেষ্টা বিরহিত এ সিদ্ধান্ত আমার সত্য বলে মনে হয় না। কতটা সচেতন-ভাবে জানি না, কিন্তু কুমুদরঞ্জন কবিতার শব্দ, চিত্র, ছন্দ, অঙ্গগঠন প্রভৃতির কথা ভেবেছেন। রূপবিবিক্ত ভাব কবিতা নয়, এই বোধ কবি কুমুদরঞ্জনের ছিল উপরের আলোচনায় এই বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি॥